শৈশবসঙ্গী



সচিত্র

(শিশুপাঠ্য গ্রন্থ)।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।

মজুমদার লাইব্রেরি,

১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯১১।

বেঙ্গল প্রেস।]

[মূল্য বার আনা।

CALCUTTA:

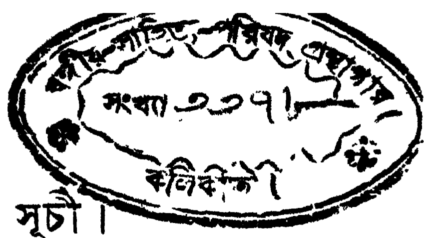
PRINTED BY R. M. DE, AT THE 'BENGAL PRESS,'
17, MADAN MITTER'S LANE.

ভূমিকা।

আমাকে কার্য্যোপলক্ষে প্রায়ই কোন কোন পুস্তকের দোকানে বসিতে হয়। অনেক ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি আসিয়া বলেন, "মহাশয়, ছেলেদিগকে বাড়ীতে পড়িতে দেওয়া যায় এমন একখানা বই দিতে পারেন কি?" দোকানদার মহাশয় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলেন, "না মহাশয়, বাঙ্গালা ভাষায় এমন কোন পুস্তক নাই।" এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর শুনিয়া শুনিয়া উক্ত প্রকারের একখানি পুস্তক প্রণয়নের ভাব আমার মনে উদয় হয়। ইংরাজিতে অবশ্য এই শ্রেণীর পুস্তকের অভাব নাই, বিশেষতঃ Evenings At Home আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের সুপরিচিত। আমার মনে হইল যে, উহারই আদর্শে কিন্তু দেশীয় আকারে একখানি পুস্তক রচনা করিলে বোধ হয় বালক বালিকাদিগের কিঞ্চিৎ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। "শৈশবসঙ্গী" এই চিন্তারই ফল।

পুস্তকখানিকে বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। এমন সব পাঠ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা পড়িলে উহাদের জীবনে ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে ধর্ম্ম ও নীতি ফুটিয়া উঠিবে, প্রকৃতিরাজ্যে যে সকল অতীব মঙ্গলকর ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম কার্য্য করিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, ও তাহার ফলে ক্রমে চঞ্চলতা ও লঘুচিত্ততা দূর হইয়া শান্তভাব আসিবে ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ আমোদও লাভ হইবে; এইরূপে মহচ্চরিত্রের উপকরণ সামান্য ভাবে সংগৃহীত হইবে।

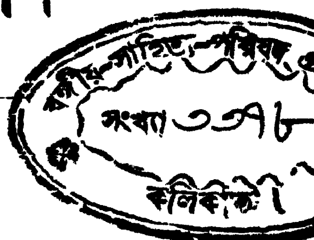
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ যদি কিয়ৎ পরিমাণেও এই মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।



সূচী ।



শৈশব-সঙ্গী।



আপন কাজ।

মধুর প্রভাতে জেগেছে সকলে
সাধিতে আপন কাজ,
সোণালী রবির সুন্দর কিরণে
ধরা পরে নব সাজ।
পাখীরা গাহিছে সুমধুর গান,
পশুগণ যায় মাঠে,
বালক বালিকা, নিদ্রা পরিহরি,
দেয় মন নিজ পাঠে।
পিপীলিকাগুলি, পিল্ পিল্ চলি,
ছুটে খাদ্য আহরণে,
মৌমাছি উড়িয়া, ফুলের উপরে
ব্যস্ত হয় মধুপানে।
কাননে কুসুম সৌরভ বিতরে
শীতল সমীর বয়,
চারিদিকে সবে, আপনার কাজে
কি উৎসাহে রত রয়!

জয় জয় বিভু, দয়ার আধার
নমি পদে শতবার,
সুন্দর ধরার নবীন আলোকে
সাধি কাজ আপনার।

সূর্য্যের কথা।

বাবা। ঐ দেখ, সূর্য্য উঠিতেছে।

সুশীল। কই, বাবা?

বাবা। ঐ দেখিতেছ না, পূর্ব্বদিক্ লাল হইয়াছে। সূর্য্য আমাদের দৃষ্টি রেখার নিম্নে আছে, কিন্তু উহার আলো আসিয়া পূর্ব্বদিকের আকাশকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

সুশীল। দৃষ্টিরেখা কাহাকে বলে, বাবা?

বাবা। কোন উচু জায়গায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে, যে রেখাতে আকাশ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেইটাই দৃষ্টিরেখা।

সুশীল। তাই ত, বাবা, মনে হইতেছে ঐ গাছগুলি যেন আকাশে ঠেকিয়াছে; ঠিক তাই না কি?

বাবা। না, সুশীল, কখনই না, গাছগুলি দূরে বলিয়াই ঐরূপ দেখাইতেছে। পৃথিবীর গোলত্বই ঐরূপ দেখাইবার কারণ।

সুশীল। সূর্য্য ত খুব ছোট, ঠিক যেন একখানা বড় থালা।

বাবা। না, সুশীল, সূর্য্য ছোট নয়, খুব বড়, আমাদের পৃথিবীর চেয়েও অনেক বড়।

সুশীল। তবে অত ছোট দেখায় কেন ?

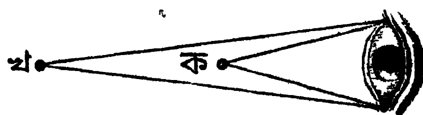
বাবা। অতি দূরে বলিয়াই অত ছোট দেখায়।

সুশীল। কত দূরে, বাবা ?

বাবা। ও! সে তুমি ভাবিতেও পারিবে না, সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটী মাইলেরও অধিক দূরে; আকাশে যদি জাহাজ চলিতে পারিত, তাহা হইলে, যে জাহাজ ঘণ্টায় দশ মাইল যায়, ক্রমাগত চলিলেও, সেই জাহাজকে সূর্য্যে পৌঁছিতে হাজার বৎসরেরও অধিক সময় লাগিত! এত দূরে বলিয়াই সূর্য্যকে অত ছোট দেখায়।

সুশীল। দূরের বস্তুকে ছোট দেখায় কেন ?

বাবা। তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না, যখন উচু ক্লাসে পড়িবে তখন বুঝিতে পারিবে। এখন জানিয়া রাখ যে, যে বস্তু যত দূরে তাহাকে তত ছোট দেখাইবে। আমরা ঐ বটগাছটার নীচ দিয়া আসিয়াছি। তুমি জান ওগাছটি কত বড়, কত বড় বড় উহার ডাল, কত দুর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু দেখ, এখন কত ছোট দেখাইতেছে!



উপরের ঐ চিত্রে চক্ষু হইতে ক চিহ্নিত পদার্থ পর্য্যন্ত দুইটি রেখা টানিয়া একটা কোণ করা হইয়াছে, এবং চক্ষুর যে দুই বিন্দু হইতে এই দুই রেখা টানা হইয়াছে, সেই দুই বিন্দু হইতেই, ক চিহ্নিত পদার্থের সহিত সমসূত্রে অবস্থিত খ চিহ্নিত পদার্থ পর্য্যন্ত, আর দুইটী রেখা টানিয়া আর একটী কোণ করা হইয়াছে। দেখিতে পাইতেছ যে, ক স্থিত কোণ, খ স্থিত কোণ অপেক্ষা বড়। জ্যামিতির সাহায্যে উহা প্রমাণও

করা যায়। জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ের একবিংশ প্রতিজ্ঞা দেখ। খ কোণ ক কোণ অপেক্ষা ছোট বলিয়াই, ক ও খ সমান হইলেও, খ ছোট দেখাইবে।

সুশীল। আচ্ছা, বাবা, আপনি বলিলেন সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়; কত বড় হইবে?

বাবা। তুমি ভূগোলে পড়িয়াছ, পৃথিবীর পরিধি প্রায় এগার হাজার মাইল, আর তুমি জান, যে দশ শততে এক হাজার হয়, আর এক শত হাজারে এক লক্ষ হয়। মনে কর, সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড বল, আর সেই বলটাকে ভাঙ্গিয়া চৌদ্দলক্ষ সমান খণ্ড করা হইল। তাহা হইলে প্রত্যেক খণ্ড আমাদের পৃথিবীর সমান হইবে: অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়।

সুশীল। কি বই পড়িলে এ সব জানা যায়, বাবা?

বাবা। কেন, জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িলে জানা যায়। এখন তুমি তাহা পড়িতে পারিবে না, মন দিয়া পড়া শুনা কর, ক্রমে এসব বিষয় জানিতে পারিবে। চল এখন বাড়ী যাই, রোদ্ উঠিয়াছে, কাল সকালে তোমাকে আর কিছু বলিব।

মার কাছে।

সুশীল। মা, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, আমাকে কিছু খাইতে দাও।

মা। আচ্ছা, বাবা, কাপড় ছাড়, একটু বিশ্রাম কর, খাইতে



দিতেছি ; শ্রমের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া খাওয়া ভাল নয়, তাহাতে শরীরের অপকার হয়।

সুশীল। কি অপকার হয়, মা ?

মা। শ্রমকালে শরীরের সমুদয় যন্ত্র কার্য্য করিতে থাকে, সুতরাং পাকস্থলী হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত নানা স্থানে ধাবিত হওয়াতে, পাকস্থলী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; এই জন্য তখন কিছু খাইলে সহজে হজম হয় না। বুঝিলে, সুশীল ?

সুশীল। হাঁ, বুঝেছি। ক্ষুধা হয় কেন, মা ?

মা। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ত কার্য্য করিতেছে ; হাত চলিতেছে, পা চলিতেছে, আমরা চক্ষু খুলিতেছি ও বুজিতেছি, শ্বাস লইতেছি ও ফেলিতেছি—এই সব ক্রিয়া দ্বারাই নিরন্তর শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এই ক্ষতির পূরণ না হইলে শীঘ্রই শরীর দুর্ব্বল, নিস্তেজ, শ্রীহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই জন্য দয়াময় ঈশ্বর কৃপা করিয়া

আমাদিগকে ক্ষুধা অর্থাৎ শরীরের এই অভাব বোধ দিয়াছেন। অতএব যখনই ক্ষুধা হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর আমাদেরই শরীর রক্ষার জন্য আমাদিগকে কিছু খাইতে বলিতেছেন। পরম গুরু পরমেশ্বর আমাদিগকে নানা উপায়ে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার উপদেশ বুঝিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিলে, আমাদের সব বিষয়েই মঙ্গল হয়; কেমন, সুশীল ?

সুশীল। আচ্ছা, মা, এখন কিছু খাবার দেও ত।

মা। এই নেও, তোমার ছোট ভাই বোনদের হাতে একটু একটু দেও, তুমি খাও। দেখ যেন ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি খাইও না।

সুশীল। কেন, মা, তাড়াতাড়ি খাইলে কি হয় ?

মা। তাড়াতাড়ি খাইলে খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বিত হইয়া লালার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না, সুতরাং পরিপাক হওয়া কঠিন হয়; দাঁত যাহা করিত, লালা যাহা করিত, সবই পাকযন্ত্রকে করিতে হয়। তিন জনের বোঝা একজনের ঘাড়ে চাপাইলে তাহার কষ্ট হইবারই কথা।

সুশীল। পরিপাক হওয়ার অর্থ কি, মা ?

মা। প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা খাদ্যদ্রব্য রক্তে পরিণত হওয়াই পরিপাক হওয়া।

সুশীল। সে প্রক্রিয়াটা কি ?

মা। সেটা তোমাকে পরে বলিব, একটু সময় লাগিবে, এখন আমি বড় ব্যস্ত। এখন পড়িবার ঘরে যাইয়া পড়াশুনা কর।

ধীরে ধীরে।

ধীরে ফোটে ঊষার আলোক,
ধীরে টোটে নিশা-অন্ধকার,
প্রভাতের অরুণ কিরণে
ঝলমল করে চারিধার।
ধীরে পাখী গেয়ে উঠে গান
ঊষা হেরি কতই পুলকে,
ধীরে ফোটে কাননে কুসুম
হেরি সেই ঊষার আলোকে।
ধীরে ধীরে বাড়িছে বয়স
দিনে দিনে আমা সবাকার,
ধীরে ধীরে বয়সের সনে
টুটিছে কি অজ্ঞান আঁধার?
ধীরে ধীরে বাড়িছে বয়স
দিন পরে দিন চলে যায়;
বাড়ে যেন জ্ঞান বুদ্ধি বল
জীবন না কাটাই হেলায়।



পড়িবার ঘরে।

সুশীল। বাবা, ভূগোলটা আমার মোটেই ভাল লাগে না; কি কতকগুলি নাম, কিছুই মনের সাম্‌নে আসে না, কেবল মুখস্থ করা,—এ ভারি আপদ।

বাবা। হাঁ, সুশীল, কেবল নাম কি ভাল লাগে? একটা কিছু ধরিবার ছুঁইবার মত মনের সামনে আসা চাই। আচ্ছা, তোমার সেই বড় থালাখানা আন ত।

সুশীল। কোন্ খানা, বাবা?

বাবা। যে খানার ধার খুব উঁচু। আর সেই ছোট ছোট পাথরের টুকুরাগুলিও আনিও।

সুশীল। আনিয়াছি, বাবা। কি করিতে হইবে?

বাবা। ঐ পাথরগুলি থালার মাঝখানে গোল করিয়া সাজাও; তার পর থালায় জল ঢালিয়া দাও।

সুশীল। দিয়াছি, বাবা।

বাবা। বল ত ওটা কি হইল? চারিদিকে জল, আর মাঝখানে স্থল দেখিতেছ ত?

সুশীল। এ--টা—বোধ হয় দ্বীপ; ভূগোলে পড়িয়াছি, "যে স্থলভাগ চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত তাহাকে দ্বীপ বলে।"

বাবা। হাঁ, সুশীল, ওটা দ্বীপই হইল। ভারতের মানচিত্র খুলিলে দেখিতে পাইবে, একেবারে দক্ষিণে লেখা আছে "সেতুবন্ধ রামেশ্বর," আর তার ঠিক ওপারেই প্রায় ডিম্বাকৃতি একটি স্থান, তাহাতে লেখা আছে 'সিংহল দ্বীপ'; উহার প্রাচীন নাম লঙ্কা। চারিদিকে অনন্ত সুনীল জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে, আর মধ্যে এই ক্ষুদ্র স্থলভাগ। তুমি 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' পড় নাই?

সুশীল। হাঁ, পড়িয়াছি, বাবা।

বাবা। তবে বল ত তাহাতে লঙ্কার কথা কি লেখা আছে।

সুশীল। বলিতেছি, বাবা, আমার খুব মনে আছে।

এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম দশরথ। তাঁহার তিন রাণী ছিল।

এই তিন রাণীর গর্ভে তাঁহার চার পুত্র জন্মে,—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। পুত্রগণ ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বৃদ্ধ রাজা তখন ইচ্ছা করিলেন যে, রামকে রাজ্য দিয়া স্বয়ং জীবনের অবশিষ্ট কাল ঈশ্বরের পূজাতেই কাটাইয়া দিবেন; কিন্তু তাহা হইল না, দ্বিতীয়া রাণী কৈকেয়ী বাদ সাধিলেন।

ইহার পূর্ব্বে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের বিষম যুদ্ধ হয়। দেবগণ কিছুতেই না পারিয়া দশরথের সাহায্য ভিক্ষা করেন। তিনি স্বর্গে যাইয়া অসুরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরে অনেক আঘাত লাগিল। মধ্যমা রাণী সেই সময়ে রাজার অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন তিনি এক বরে রামের বনবাস, অন্য বরে নিজের পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। সুপুত্র রাম পিতার সত্য পালনের জন্য বনে গমন করিলেন। পতিপ্রাণা সীতা ও প্রাণতুল্য ভাই লক্ষ্মণও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। রাজধানী অযোধ্যায় হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কৈকেয়ীর পুত্র ভরত ও সুমিত্রার পুত্র শত্রুঘ্ন তখন মাতুলালয়ে ছিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া, রাম বনে গমন করিয়াছেন শুনিয়া, ভ্রাতৃশোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশে চলিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে তাঁহার সহিত দেখা হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই ফিরিলেন না। তিনি ভরতকে বলিলেন, দেখ, ভাই, সত্যের চেয়ে ভাল আর কিছুই নাই, এবং সত্য ছাড়া আর ধর্ম্মও নাই; আমি এমন সত্যকে কখনই ছাড়িব না, ও পিতাকে অসত্যবাদী করিব না। তুমি

যাও, আমি চৌদ্দ বৎসর পরে বাড়ী যাইয়া তোমাদের সঙ্গে পরম সুখে রাজত্ব করিব। এই কয়েক বৎসর তুমি প্রজাপালন কর। ভরত অগত্যা জ্যেষ্ঠের পাদুকা মস্তকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

লঙ্কাতে এক রাজা ছিল, তার নাম রাবণ। তার দশটা মাথা ও কুড়িখানা হাত। সে বড় দুর্বৃত্ত ছিল। একদিন সে দণ্ডকারণ্যে আসিয়া সীতাকে চুরি করিয়া লইয়া গেল। রাম তখন কুটীরে ছিলেন না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া, সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, শোকে কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তার পর বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া হনুমানকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইলেন। হনুমান লঙ্কাতে অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া আসিয়া রামচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। রামচন্দ্র বানরদিগের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাবণকে সবংশে নিহত ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

ভাল ছেলে ও মন্দ ছেলে।

(১)

ভাল ছেলে পাঠশালে
সোজা চলে যায়,
দাঁড়ায়ে না কথা কয়,
পথে না খেলায়।

(২)

মন্দ ছেলে পথে দেরী
করে খেলা নিয়ে,
পুকুরে ভাসায় জুতা
পাল তুলে দিয়ে।

(৩)

ভাল ছেলে বড় আশা
হৃদয়েতে পোষে,
একমনে আপনার
পড়া করে বসে।

(৪)

মন্দ ছেলে সারাদিন
ঘোরে হেসে খেলে,
না চায় ছুঁইতে বই,
পায়ে ছুঁড়ে ফেলে।

(৫)

ভাল ছেলে পড়া দিতে
নাহি করে ডর,
জিজ্ঞাস যা দেয় তার
তখনি উত্তর।

(৬)

মন্দ ছেলে মাথা তার
চুলকনা সার,
"চিক্কণ" বানান করে
চয়েতে আকার।

(৭)

ভাল ছেলে পড়া তার
ভাবে শুধু বসে,
অঙ্কটি না দিতে দিতে
দেয় তাই কসে।

(৮)

মন্দ ছেলে শ্লেট ধরে
কাটিয়া আঁচড়,
মুখ লুকাইয়া দেয়
সন্দেশে কামড়।

(৯)

ভাল ছেলে ধেয়ে চলে
পুলকিত মন,
পাইয়াছে পুরস্কার
মনের মতন।

(১০)

মন্দ ছেলে দাঁড়াইয়া
যেন জানোয়ার,
মাথায় গাধার টুপি
খাসা পুরস্কার!

খেলার ঘরে।

সুশীল। সরলা, এস আমরা এক খেলা খেলি। মনে কর, তুমি অন্ধ মেয়ে, আমি তোমার মাষ্টার।

সরলা। আচ্ছা, দাদা।

সুশীল। তবে তুমি চোখ বুজিয়া বোস।

সরলা। এই বসিয়াছি।



সুশীল। বল ত, এটা কি?

সরলা। এটা বিড়াল, মাষ্টার মহাশয়।

সুশীল। বেশ বেশ, তুমি ত বেশ মেয়ে। ইহার বিষয় তুমি কি জান, আমাকে বল ত।

সরলা। (বিড়ালটাকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া) ইহার শরীর অতি নরম লোমে ঢাকা। ইহার একটা লম্বা লেজ আছে। লেজে হাত

দিতে দেয় না। ইহার একটা মাথা, লম্বা দুইখানা কাণ, আর একটা মুখ। ইহার দাঁতগুলি সরু সরু, এবং ত্যক্ত না করিলে কামড়ায় না। ইহার পায়ের তলা নরম। খুব ধারাল নখ আছে। ইহাকে মারিলে নখ দিয়া আঁচাড়াইয়া দেয়।

সুশীল। বেশ! বেশ! আর কিছু জান কি?

সরলা। হাঁ, জানি বই কি। এ ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতেছে। বোধ হয় পলাইয়া যাইতে চায়। ইহার খিদে পাইয়াছে, কিছু খাইতে চায়। আমি ইহার পিঠ চাপড়াইতেছি, আর এ ঘড় ঘড় শব্দ করিতেছে। বোধ হয়, খুব খুসী হইয়াছে।

সুশীল। দেখ, অন্ধ মেয়েটি, আমি এখন ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শুন। তুমি অন্ধ বলিয়া সে সব জানন। বিড়ালটার গায়ে সুন্দর সুন্দর কাল কাল দাগ আছে, আর উহার মুখ ও বুক শাদা। উহার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ কাচের মত, মধ্যস্থলে একটা কাল দাগ। এই দাগটার আকার বদলাইয়া যায়, রৌদ্রের সময় সরু ও লম্বা হয়, আর সূর্য্য অস্ত গেলে চওড়া হয়। সুতরাং অধিক আলো প্রবেশ করিতে পারে। এই কারণে বিড়াল রাত্রেও প্রায় দিনের মত দেখিতে পায়। তুমি অন্ধ বলিয়া আমার বড়ই দুঃখ!

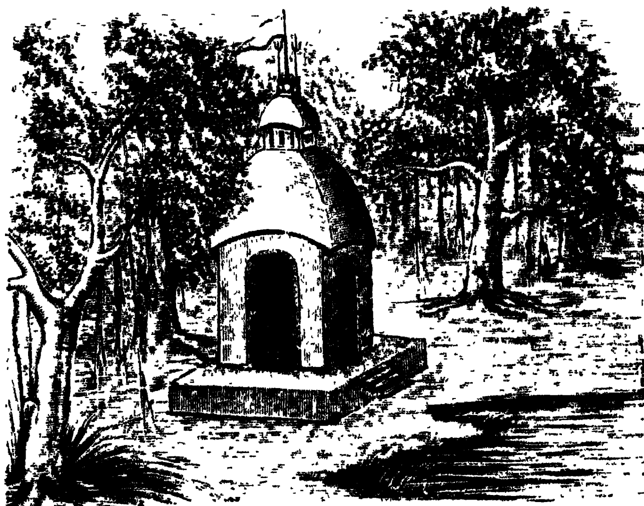
সরলা। কি দুঃখ, দাদা, এই দেখ আমি চোখ মেলিয়াছি।

পথে।

বাবা। চল, এখন স্নান করিতে যাই, বেলা নয়টা বাজিয়াছে।

সুশীল। বাবা, আপনি রোজ স্নান করিতে বলেন কেন! স্নান করিলে কি উপকার হয়?

বাবা। অনেক উপকার, সুশীল। শরীর কেমন শীতল ও স্নিগ্ধ বোধ হয়! মন কেমন প্রফুল্ল থাকে! শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ; শরীর ভাল থাকিলে মনও ভাল থাকে, আবার মন ভাল থাকিলেও শরীর ভাল থাকে। আমাদের শরীরে অগণ্য ছিদ্র আছে, সেগুলিকে লোমকূপ বলে; কারণ প্রত্যেক ছিদ্রের মধ্য হইতে একগাছি লোম বাহির হইয়াছে। এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া ঘর্ম্মের সঙ্গে শরীরের মধ্যস্থিত দূষিত পদার্থ সকল নিরন্তর বাহির হইয়া যাইতেছে। অনেক সময়ে ময়লা জমিয়া এই ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়। উত্তমরূপে গাত্র মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে এই ময়লা দূর হইয়া যায়, এবং লোমকূপগুলি অবাধে তাহাদের কার্য্য করিতে পারে।



ঐ দেখ একটা মন্দির।

সুশীল। মন্দির কাহাকে বলে?

বাবা। আমাদের বাড়ীতে যে ঠাকুর ঘর আছে তাহা ত দেখিয়াছ, উহারই ভাল নাম মন্দির; অর্থাৎ যে ঘরে কোন দেবতার পূজা হয়, তাহাকেই মন্দির বলে।

সুশীল। এটা কোন্ দেবতার মন্দির, বাবা?

বাবা। এটা শিব মন্দির। তুমি শিব দেখিয়াছ?

সুশীল। হাঁ, বাবা, দেখিয়াছি! সেই যে দাদা মহাশয়ের পূজার দালানে এক শিব আছেন,—বাঘ ছাল পরা, সাপের পৈতা, হাড়ের মালা, আর বাঘছালের উপর তানপুরা হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। উহাঁর হাতে তানপুরা কেন, বাবা?

বাবা। উনি বড় সাধু, সর্ব্বদা তানপুরার সঙ্গে পরমেশ্বরের গুণগান করিতেছেন। আমাদের দেশে তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবই প্রধান; কিন্তু ইহাঁদের উপরে এক দেবতা আছেন, তিনি দেব মানব সকলেরই পূজ্য, শিব তাঁহারই গুণগান করেন। তুমি বড় হইয়া যখন শাস্ত্র পড়িবে, তখন এসব জানিতে পারিবে।

এ স্থানটি অতি সুন্দর! কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! কেমন নির্জ্জন ও নীরব! মন এখানে শান্তি পায়। মন্দিরটি অতি প্রাচীন, ইহার বয়স একশত বৎসরের কম হইবে না, তবুও দেখ একখানা ইটও সরিয়া যায় নাই। চূড়াটি ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়া নীলাকাশে যেন মিশিয়া গিয়াছে! ইহার চারিদিকেই বাগান, বাগানের শেষে একটা পুকুর। পুকুরটার জল অতি পরিষ্কার। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক জল লইতে আইসে, আর যে ধর্ম্মশীল সাধুব্যক্তি এসব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই রকম কাজ অনেক করিতেন। অতি ক্ষোভের বিষয় যে, আমাদের দেশে এইরূপ সৎকার্য্যে লোকের আর মতি নাই, মানুষ ধর্ম্মার্থে ও পরার্থে

আর কিছু করিতে চায় না, কেবল স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। কেবল স্বার্থ লইয়া থাকা কিন্তু মনুষ্যত্ব নহে; যিনি পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারই জীবন ধন্য।

ঘাটে।

সুশীল। এটা কি নদী, বাবা ?

বাবা। এটা গঙ্গা।

সুশীল। নদী কোথা হইতে আইসে ?

বাবা। পর্ব্বত হইতেই নদীর উৎপত্তি।

সুশীল। নদীটা বহিয়া যাইতেছে কেন ?

বাবা। জল স্বতঃই নিম্নদিকে যায়।

সুশীল। নদী কোথায় যাইতেছে ?

বাবা। সমুদ্রে।

সুশীল। নদী কি সব জায়গাই সমান চওড়া ?

বাবা। না, প্রথমে খুব সরু থাকে, তার পর যত নামিয়া আইসে ততই চওড়া হয়।

সুশীল। গঙ্গা কোথা হতে উঠিয়াছে, বাবা

বাবা। হিমালয় হইতে। হিমালয়ে যেস্থান হইতে গঙ্গার স্রোত বাহির হইতেছে, সে স্থানটা গোরুর মুখের মত, সেইজন্য তাহাকে গোমুখী বলে। এই স্থানটি হরিদ্বারের নিকটে। সেখানে গঙ্গা অতি সরু, একজন লোক লাফ দিয়া পার হইতে পারে; কিন্তু পরে স্রোতের বেগে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া অবশেষে শতবাহু প্রসারণপূর্ব্বক সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছে। প্রয়াগে যমুনা আসিয়া ইহার সহিত মিশিয়াছে।

দুই নদীর মিলনকে তাহাদের সঙ্গম বলে। নদীর সহিত সাগরের মিলনকে সাগরসঙ্গম বলে। গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশিয়াছে, তাহাকে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম বলে। ইহা একটি হিন্দুতীর্থ। যমুনা গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে বলিয়া উহা গঙ্গার একটি উপনদী।

সুশীল। উপনদী কাহাকে বলে, বাবা?

বাবা। যে নদী পর্ব্বত হইতে উঠিয়া অন্য নদীতে পড়ে, তাহার নাম উপনদী। আর যে নদী অপর কোন নদী হইতে নির্গত হইয়া সাগরে পড়ে তাহার নাম শাখা-নদী।

সুশীল। নদী দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়?

বাবা। আমরা ইহাতে স্নান করি, ইহার জল খাই। নদী ভূমিকে সরস করে, তাহাতেই ভূমি উর্ব্বরা হয়। গঙ্গা না থাকিলে উত্তর ভারত মরুভূমি হইত। আর নদী বাণিজ্যের সহায়। পূর্ব্বে এদেশে রেল ছিল না, লোকে নৌকা যোগে দূরদেশে যাতায়াত করিত। এই জন্য উত্তর ভারতের প্রায় সব বাণিজ্য-প্রধান নগরই গঙ্গাতীরে অবস্থিত। নদী আবার পয়ঃ-প্রণালীর কাজ করে; কোন স্থানে যে জল পড়ে, মাটি তাহার কিয়দংশ শুষিয়া লয়, অপর অংশ নদীতে আসিয়া পড়ে, এবং নদী হইতে ক্রমে সমুদ্রে গিয়া পড়ে। এইরূপে নদী দ্বারা দেশের অতিরিক্ত জল নিস্সৃত হইয়া স্বাস্থ্য রক্ষা হইতেছে

ভিখারী ও বালিকা।

ভিখারী—সারা দিন হায়! ফিরি দ্বারে দ্বারে
কেহ নাহি ফিরে চায়,
(ওগো) সবে মোর পানে, ভ্রুকুটি হানিয়া
নীরবে চলিয়া যায়।

সাঁজের আঁধার, আসে ঘনাইয়া,
কি লয়ে যাইব ঘরে,
কি বলে বুঝাব, ম্লান মুখে যবে,
দাঁড়াবে আমায় ঘিরে?

পথ পানে চেয়ে, আছে উপবাসী
গৃহে আমি ফিরে গেলে,
কি আনিছ বলে সুধাইবে যবে
কি দিব গো হাতে তুলে?

দিবা অবসানে সবার ভবনে
আনন্দের কোলাহল,
আমি আঁধার কুটীরে লয়ে যাই শুধু
যাতনার অশ্রুজল।

দীনের রোদনে জাগে না করুণা,
তোমাদের বুক মাঝে,
হৃদয়ের দ্বার রেখেছ রুধিয়া
শোক দুঃখ নাহি বাজে!

নয়নের পাতা ভেজে নাকো হায় !
ব্যথিতের আর্ত্তস্বরে,
করুণার অশ্রু ফেল না তোমরা
ভুলেও কাহারো তরে !

বালিকা।—কে গো হেথা বসি কাঁদিছ নীরবে
নাহি কি তোমার গৃহ,
মুছাতে তোমার এই অশ্রুধার
নাহি কি তোমার কেহ ?

শত ছিন্ন বাস অবসন্ন দেহ
মলিন আনন খানি,



কেন থেকে থেকে, উঠিতেছে কাঁপি
জীর্ণ শীর্ণ দেহ, শুনি।

বুঝিয়াছি তুমি হওগো ভিখারী
তাই ত মলিন বাস,
ভীষণ দুঃখের মূরতি যে হায়,
নয়নেতে পরকাশ।

মোছ অশ্রুধার লও তুমি সব
যা কিছু আমার আছে,
আসিও আবার দিব আমি আরো
চাহিয়া মায়ের কাছে।

ভিখারী—'চিরজিবী হও' এ দীন ভিখারী
এই আশীর্ব্বাদ করে,
এমনি যেন মা হৃদিখানি সদা
কাঁদে গো দুঃখীর তরে।

রান্না ঘরে।

মা। বাবা সুশীল, রান্না হইয়াছে, খাইতে এস। সকালে খাইয়াছিলে, তার পর প্রায় চার ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে, আর দেরি করিও না।

সুশীল। এই এসেছি, মা, ভাত দেও। তুমি যে বলিতেছিলে, চার ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে, আর দেরি করিওনা—এ কথা কেন বলিলে, মা ?

মা। খাইতে বসো, বলিতেছি। ভুক্ত বস্তু পরিপাক করিতে তিন ঘণ্টা লাগে। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু খাওয়া উচিত নহে, তাহাতে পরিপাকের বাধা হয়। মনে কর একটা কলে গম ভাঙ্গিয়া ময়দা হইতেছে। ময়দা প্রায় হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে যদি আবার নূতন গম দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোলমাল হয় না ? সেইরূপ ভুক্ত দ্রব্য

যখন পরিপাক হইতেছে, তখন আবার কিছু খাইলে, এক সময়ে পাক-যন্ত্রের দুই ক্রিয়া হইতে থাকে। ইহাতে ভুক্ত বস্তু ভাল করিয়া পরিপাক হয় না, পাকযন্ত্র অধিক খাটিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে। অন্য দিকে আবার অধিকক্ষণ পেট খালি থাকিলেও পাকযন্ত্র ভাল থাকে না; সুতরাং পরিপাকের জন্য অত্যাবশ্যক তিন ঘণ্টার পর, এক ঘণ্টা পাকযন্ত্রকে বিশ্রাম দিয়া, কিছু খাওয়াই উচিত।

সুশীল। পরিপাক কিরূপে হয়, মা ?

মা। প্রথমতঃ অন্ন মুখে দিয়া চিবাই। তৎকালে তাহার সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া, অন্নকে অনেক পরিমাণে নরম ও পাকস্থলীতে পরিপাকের উপযোগী করিয়া দেয়। এই জন্য আস্তে আস্তে চিবাইয়া খাওয়া উচিত; তাহা না হইলে দন্তের ক্রিয়াটা পাকস্থলীকে করিতে হয়। তিন জনের কর্ম্ম যদি একজনে করে, তাহা হইলে কি হয়, বুঝিতেই পার,—পাকস্থলী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তার পর অন্ন কণ্ঠনালীর দ্বারা পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়। তৎক্ষণাৎ অম্লরস আসিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, এবং অন্ন পাকস্থলীতে আলোড়িত হইতে থাকে; ঘুরিতে ঘুরিতে উহা একপ্রকার কাদার মত হইয়া যায়। তৎপর প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা এই পদার্থের সারাংশ রক্তে পরিণত হয়। এই রক্ত শিরা দ্বারা শরীরের সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত হইয়া শরীরকে পোষণ করে। অসারাংশ মলরূপে বাহির হইয়া যায়। দেখ, সুশীল, কে একজন যেন ভিতরে থাকিয়া এই আশ্চর্য্য কল চালাইতেছেন, তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি। তিনি আমাদের কেমন উপকারী বন্ধু! আহারের সম্বন্ধে আমি যে সব নিয়ম বলিলাম, তাহা পালন করিলে শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। এ জগতে যাহারা মঙ্গলময় ঈশ্বরের অতীব হিতকর নিয়ম সকল পালন করিয়া চলে, তাহারাই সুখী হইয়া থাকে।

লবণ।

সুশীল। মা, মা, তরকারিতে লবণ দেও কেন?

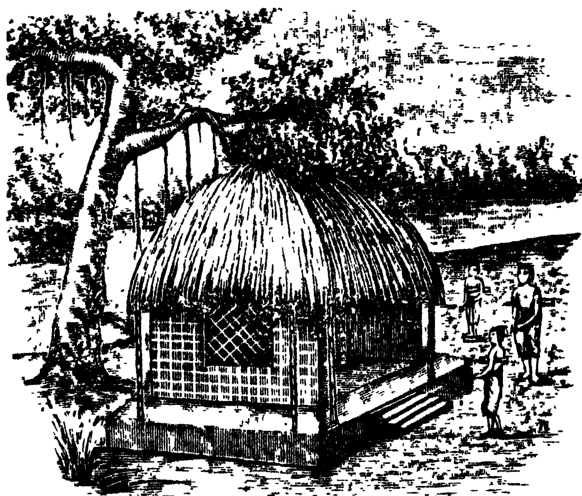
মা। লবণ না দিলে কোন তরকারিই যে মিষ্ট হয় না, অলবণ তরকারি খাইতে অতি খারাপ লাগে। তাহা ছাড়া আমাদের শরীর রক্ষার জন্য খনিজ পদার্থের প্রয়োজন, কারণ ইহা আমাদের দেহ যে যে পদার্থে নির্ম্মিত তাহার মধ্যে একটী। সকল খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেই লবণ আছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয় বলিয়া তরকারিতে লবণ দিতে হয়। লবণের দরকারও আছে, সুস্বাদও উৎপন্ন করে। ঈশ্বর কৃপা করিয়া প্রত্যেক প্রয়োজনীয় পদার্থের সহিত সুখ মিশ্রিত রাখিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা!

দ্বিতীয়তঃ, ভূগর্ভে লবণের স্তর আছে; লোকে মাটি খুঁড়িয়া সেখান হইতে লবণ বাহির করে। কুলিরা লবণের স্তর পর্য্যন্ত গর্ত্ত করিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দেয়, লবণ জলে গলিয়া যায়, তার পর সেই লোণা জল কলে তুলিয়া লইয়া জ্বাল দেয়।

তৃতীয়তঃ। কোন কোন দেশে লোণা জলের উৎস আছে, সেখানে লোকে উৎস হইতে জল তুলিয়া লইয়া জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তত করে।

কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষের চরিত্রকে লবণের সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন যে, লবণ না দিলে যেমন তরকারি বৃথা, চরিত্র ভাল না হইলে তেমনি জীবন বৃথা। তরকারিতে তুমি নানা রকম মশলা দিতে পার, কিন্তু যদি লবণ না দেও তাহা হইলে তাহা কখনই সুস্বাদ হইবে না; সেইরূপ তোমার ধন থাকিতে পারে, মান থাকিতে পারে, বংশগৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার চরিত্র যদি

সৎ না হয়, তাহা হইলে জীবন বিফল। সাধুতাই জীবনের মধু ও সুস্বাদ। অতএব সর্ব্বদা মন প্রাণ দিয়া সৎ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।



কখনই না।

হরিপুর একখানি ছোট গ্রাম। দক্ষিণে একটি ছোট নদী, গ্রীষ্মকালে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, কিন্তু জল খারাপ হয় না। বার মাসই স্রোত বহে, আর নীচে পরিষ্কার বালি। স্থানে স্থানে কুল্ কুল্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। দূর হইতে সে শব্দ অতি মিষ্ট শুনায়, মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় করিয়া দেয়। নদীর ধারে একটা বড় বটগাছ, বটগাছের নীচে একখানা লম্বা খড়ের ঘর, তাহাতেই একটি ছেয়া মুখ চুম্বন করিয়া পাঠশালার উত্তরে একটা মাঠ ... কাজ করিয়াছ, যে সত্য রক্ষা করিতে হইলে ... মানুষ হয়। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, সত্যের প্রতি চিরদিনই

তোমার ভালবাসা যেন এইরূপ থাকে। মার আনন্দ দেখিয়া সত্যপ্রিয় প্রহারের যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল, এবং আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে প্রণত হইয়া মার পদধূলি লইল।

এই বালক বড় হইয়া স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে সকলেরই পূজ্য হইয়াছিল, এবং সংসারে যথেষ্ট সাধুকার্য্য করিতেও সমর্থ হইয়াছিল।

কি বল ত ?

বাবা। সুশীল, এটুকু কি বলত ?

সুশীল। কেন, ওটুকু খড়ি, আমরা রোজ স্কুলে খড়ি দিয়া বোর্ডে লিখি।

বাবা। সুশীল, খড়ি অতি আশ্চর্য্য জিনিষ। ইহার সম্বন্ধে সব কথা শুনিলে তুমি অবাক্ হইয়া যাইবে। ইহা কিরূপে হইয়াছে, তাহা শুনিলে এই পৃথিবীটা আস্তে আস্তে কেমন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিবে।

সুশীল। তাই নাকি ? তবে বলুন, বাবা।

বাবা। দেখ্, সুশীল, ইহা নড়েও না, চড়েও না, যেখানে রাখ সেখানেই থাকে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন ইহা নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইত, ইহার হাত পা ছিল, মুখ ছিল, চোক্ ছিল, সবই ছিল,

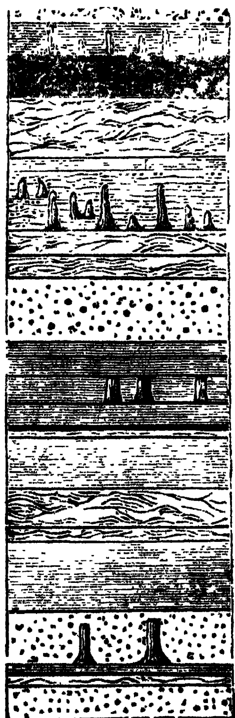
সাগরজলে আনন্দে আহার বিহার করিত, ইহার কত সঙ্গী ছিল, ছেলে পেলেও হয়ত ছিল। কিন্তু তুমি জান, যে সকলেরই মরণ আছে। এই যে আমি তোমার সম্মুখে বসিয়া কত কথা কহিতেছি, তুমি আমাকে কত ভাল বাসিতেছ, আমিও একদিন চলিয়া যাইব, এই শরীরটা পড়িয়া থাকিবে, আর নড়িবেও না, চড়িবেও না। ইহারও ক্রমে তাহাই হইল,— জন্মিল, বাড়িল, জীবনের সুখ দুঃখ ভোগ করিল, অবশেষে মরিয়া গেল, দেহটা পড়িয়া রহিল।

সুশীল। তবে কি এটা একটা জীব ছিল, বাবা?

বাবা। হাঁ, তাই ত।

সুশীল। তার পর কি হইল?

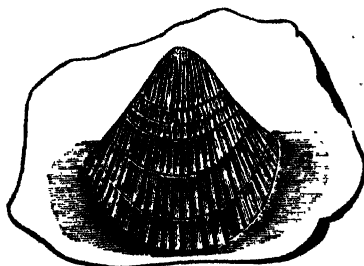
বাবা। তীরের মাটি ভাঙ্গিয়া সর্ব্বদাই সাগরে পড়িতেছে, নদী অনেক মাটি বহিয়া আনিয়া সমুদ্রে ঢালিয়া দিতেছে। এইরূপে এক সময়ে যেস্থান সাগর গর্ভে ছিল, তাহা কালে বন, নগর, গ্রামে পরিণত হইতেছে! এইরূপে ক্রমে ইহার মৃত দেহ মাটি চাপা পড়িয়া গেল, স্তরের উপর স্তর, কত স্তরই ইহার উপরে পড়িল। কয়লার স্তর, পাথরের স্তর, আরও কত কি? চাপে চাপে বেচারী ক্রমে এইরূপ হইয়া গিয়াছে।



ভূস্তর।

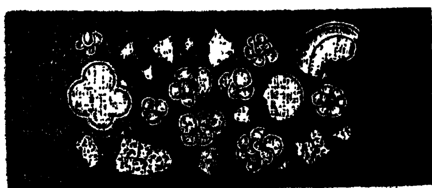
সুশীল। তবে কি ইহা কোন জীব দেহ?

বাবা। হাঁ, তাইত, জীবদেহই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া এই রূপ হইয়া পড়িয়াছে।



সুশীল। তাহা কেমন করিয়া বুঝিব, বাবা ?

বাবা। তোমার কাঁচের গ্লাস্‌টাতে এক গ্লাস্ জল পুরিয়া আন। তারপর একটু চক্ গুড়াইয়া গ্লাসে ফেলিয়া দাও। চকের গুড়া সব নীচে পড়িয়া গেলে জলটা ফেলিয়া দাও, তারপর অনুবীক্ষণ দিয়া দেখ। কি দেখিতে পাইতেছ ?



সুশীল। অতি ছোট ছোট কি সব দেখা যাইতেছে। কতকগুলি ভাঙ্গা শামুকের খোলার মত, কতকগুলি টুকুরা স্পঞ্জের মত, আরও কত কি ?

বাবা। তবেই দেখ, সুশীল, খড়ি জীবদেহ হইতেই হইয়াছে ! কত কালে যে হইয়াছে, কে বলিতে পারে ? এক একটা স্তর হইতে



হাজার হাজার বৎসর লাগিয়াছে! কতকালে যে এই পৃথিবী গঠিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। কি আশ্চর্য্য!

পৃথিবীতে কোন জিনিষই ফেলা যায় না। এই সকল জীব বহুকাল পূর্ব্বে সাগর গর্ভে ছিল, তখন যে জগতের কি উপকার সাধন করিয়াছে, জানি না। এখন দেখ, ইহাতে আমাদের মুখ ধোয়া হইতেছে, লেখা হইতেছে, ঔষধেও লাগিতেছে। বিধাতার মঙ্গলময় রাজ্যে কিছুই বৃথা আসে না, যায়ও না, সকলকেই তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া তাঁহার কার্য্য করিতে হয়। তুমিও একটা বিশেষ কাজ করিতে আসিয়াছ, আমিও একটা বিশেষ কাজ করিতে আসিয়াছি। সেই বিশেষ কাজটা বুঝিয়া লইয়া সেই দিকে চলিলেই জীবন সফল হয়।

ঐ ছেলেটি কে?

বাবা। সুশীল, ঐ ছেলেটি কে বল ত?

সুশীল। না, বাবা, আমি ত উহাকে চিনি না। আমি কখনও উহাকে দেখিয়াছি কি?

বাবা। না, তুমি উহাকে দেখ নাই; আমরাই উনি যখন বৃদ্ধ তখন উঁহাকে দেখিয়াছি। যদি দেখিতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে, যে বাহিরের রূপ কিছুই নহে, ভিতরের গুণই সব। উনি দেখিতে সুন্দর ছিলেন না, বরং বিশ্রীই ছিলেন, কিন্তু উহাঁর গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গবাসী যদি অমানুষ হইয়া না যায়, তবে উহাঁর কাছে চিরদিনই কৃতজ্ঞ অন্তরে মস্তক অবনত করিবে। আজ কাল আমাদের দেশের ছেলেরা যে বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেছে,

তাহা উহাঁরই প্রসাদে। উনি প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সবশ্রেণীর উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বই করিয়া গিয়াছেন; সংস্কৃত শিক্ষারও একটা সহজ উপায় করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ইনি আমাদের জন্যই জন্মিয়াছিলেন। কি করিলে আমাদের দেশের লোক মানুষ হইবে—ইহাই তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। আহা! তেমন লোক কি আর হয়!

সুশীল। এ ছেলে এত ভাল লোক কেমন করিয়া হইল, বাবা?

বাবা। ঐ দেখিতেছ না, পড়া শুনায় কেমন যত্ন ও অনুরাগ! বাবা অতি গরীব, মাত্র আটটী টাকা মাইনা পান, রান্ধিবার লোক রাখিবার অথবা কলিকাতায় পরিবার আনিয়া রাখিবার উপায় নাই, অথচ নিজেকে মুনিবের কাজে বাহিরে যাইতে হয়। ছেলেটি অগত্যা নিজে রান্ধিয়া দশটার সময় খাইয়া স্কুলে যায়, বাবার জন্য ভাত রাখিয়া যায়। কিন্তু, সুশীল, ও ছেলে রোজই ক্লাসে প্রথম থাকে! পড়া শুনায় যার এত অনুরাগ, পিতা মাতার প্রতি যার এত ভালবাসা, সে বড় হইবে না ত কে হইবে? ভাল বিষয়ে যাহার অনুরাগ আছে, সে ভাল হইবেই হইবে। এ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। উহার নাম ঈশ্বর-চন্দ্র; বড় হইয়া উনিই সকলের পূজ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন।



ভাই ভাই।

ভাইয়ের স্নেহে
আছি বাঁধা ভাই
সুখে আছি তাই মোরা,
ভাই কোলে ভাই
আছি লুকাইয়া
সহজে না দিব ধরা।
স্নেহ-ডোরে বাঁধা
আছি ভাই ভাই
দুঃখ শোক নাহি জানি,
ভাই বিনা ভাই
কিছুই জানি না
ভাবি তার মুখখানি।

নাহি জানি দ্বেষ
নাহি জানি হিংসা
ক্রোধ লোভ কারে বলে,
কলহ বিবাদ
কিছুই জানি না
আছি ভ্রাতৃ-স্নেহে ভুলে।
(ভাইয়ের) এস গলা ধরে
ভাই চুম খাই
(নাই) "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,"
(শুধু) ভাইয়ের সুখেতে
সুখ আমাদের
আর কিছু নাহি চাই।

আমি যাই।



সে অনেক দিনের কথা। তখন ইউরোপীয়েরা কেবল এদেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একবার একখানা জাহাজ এদেশে আসিতে-ছিল, আসিতে আসিতে ঝড়ে ডুবিয়া গেল, বার জন মাত্র লোক কিছুদিনের খাদ্য সামগ্রী লইয়া একখানি ছোট নৌকায় উঠিয়া অকূল সাগরে ভাসিল। দিন গেল, রাত্রি গেল, সপ্তাহ গেল, কিন্তু তীরের দেখা নাই, অন্য কোন জাহাজেরও দেখা নাই। ক্রমে খাদ্য ফুরাইয়া আসিল। তখন দেখা গেল, যে প্রতিদিন একজন লোককে জলে ফেলিয়া দিলে, যে খাদ্য সামগ্রী ছিল তাহাতে আর কয়েক দিন চলিতে পারে, এবং অন্ততঃ দুই চারিজনও অবশেষে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া

স্বদেশবাসীদিগকে এই ভীষণ বিপদের সংবাদ দিতে পারে। দুই চারি জন এইরূপে সাগরজলে আত্মবিসর্জন করিল। একদিন এক ব্যক্তির নাম উঠিল, তাহার এক ছোট ভাই সেই জাহাজে, আর স্ত্রী ও কয়েকটি শিশু সন্তান দেশে, ছিল।

ছোট ভাই বলিল, দাদা, তোমার মরা হইবে না, তোমার বাঁচিয়া থাকিবার অনেক দরকার; তুমি বাঁচিয়া থাকিলে, তোমার স্ত্রীপুত্র অন্ন পাইবে, আমি মরিলে জগতের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবে না; অতএব তোমার হইয়া আমিই যাই। তোমার জন্য, তোমার সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য, আমি জীবন দিব,—ইহা অপেক্ষা আমার জীবনের সার্থকতা আর কি হইতে পারে?

বড় ভাই কিছুতেই সম্মত হইলেন না; তিনি কোন্ প্রাণে স্নেহের পুতলি ভাইটিকে নিজের জন্য মরিতে দিবেন? প্রয়োজন হইলে বরং নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করা উচিত। এইরূপে উভয়ের মধ্যে উপরোধ অনুরোধ, ক্রন্দন, মিনতি চলিতেছে, এমন সময়ে ছোট ভাই পকেট হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া হঠাৎ নিজের বুকে বসাইয়া দিল। আর তার সংজ্ঞা নাই, মুখে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ, নিশ্চল! ধীরে ধীরে হৃদয়ের শোণিত বাহির হইয়া জীবনী শক্তির হ্রাস করিয়া দিতেছে! ভাই ক্ষতের উপর কাপড় চাপা দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত নির্গম নিবারণ করিতেছে! এমন সময়ে দূরে একখানা জাহাজ দেখা দিল। নৌকারোহিগণ নানা সঙ্কেত করিয়া জাহাজের লোকদিগকে বুঝাইল, যে তাহারা বিপদে পড়িয়াছে। জাহাজ দ্রুত বেগে নৌকার কাছে আসিয়া বিপন্ন লোকদিগকে তুলিয়া লইল। জাহাজে একজন ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় ও সকলের শুশ্রূষায় রোগী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল, অবশেষে জাহাজ যখন

বন্দরে পৌঁছিল। তখন দেখা গেল যে, সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

কি আশ্চর্য্য ভ্রাতৃ স্নেহ!

অদ্ভুত পাঠশালা।

কোন গ্রামের নিকটে একটা বন ছিল। সেই বনে অনেক বানর বাস করিত। গ্রামের লোকদিগকে তাহাদের অনেক উৎপাত সহ্য করিতে হইত। সময়ে সময়ে তাহারা দল বাঁধিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিত, এবং হাতের কাছে যাহা পাইত তাহাই লইয়া পলায়ন করিত।

গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল। একদিন একটা বড় বানর আসিয়া পাঠশালার নিকটে একটা গাছে বসিল। গুরুমহাশয় ছড়ি হাতে করিয়া একখানা চৌকির উপর বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে ছেলেদিগকে বকিতেছেন, কখনও বা কাহাকে প্রহার করিতেছেন। গুরু মহাশয়দিগের হাত বড়ই চলে। তাঁহারা যেন মনে করেন, বেতের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার বলে উহার সংস্পর্শে ভিতরে বিদ্যা প্রবেশ করে! ছেলেদের মারাটা অতি খারাপ প্রথা; উহাতে লাভ কিছুই হয় না, বরং তাহারা নিষ্ঠুরতা শিখে, এবং লেখা পড়া ক্রমে তাহাদের কাছে তিক্ত হইয়া যায়। যাহাতে আমোদ নাই, অথচ ক্লেশ আছে, তাহা ছেলেরা চায় না। বানরটা অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে গাছের উপর বসিয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে জল খাবারের ছুটি হইল, আর ছেলেরা বই শ্লেট রাখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছেলেরা চলিয়া গেলে, বানরটা নামিয়া আসিয়া, কতকগুলি বই শ্লেট লইয়া পলায়ন

করিল। ছেলেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বই শ্লেট নাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহারা ঠিক করিল যে, সেই বানরটারই এই কর্ম্ম, সেই



বই শ্লেট লইয়া পলাইয়াছে। তখন তাহারা সকলে বনের দিকে ছুটিল। যাইয়া দেখে, সেই বড় বানরটা একটা খোলা জায়গায় একটা ঢিপির উপরে লাঠি হাতে করিয়া আর তাহার চারিদিকে কতকগুলি বানর বই শ্লেট হাতে করিয়া, বসিয়া আছে। বড় বানরটা মাঝে মাঝে কিচির মিচির করিয়া কি বকিতেছে, আর এক এক বার এক একটাকে প্রহার করিতেছে! ছেলেরা ত দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, গুরুমহাশয় বই শ্লেট ফেলিয়া লেজ তুলিয়া সশিষ্যে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ছেলেরাও বই শ্লেট গুলি লইয়া পাঠশালে ফিরিয়া আসিল।

মানুষ অবশ্য বুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইতর প্রাণীদিগেরও বুদ্ধি আছে, বিশেষতঃ বানরের বুদ্ধি অতি আশ্চর্য্য।

জয় জয় সত্যের জয়।

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ!
জয় জয় সত্যের জয়!

মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন!
জয় জয় সত্যের জয়!

যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়!
যদি দৈন্য সহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়!
জয় জয় সত্যের জয়।

"কখনই না।"

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় একজন অতি ধনীলোক ছিলেন, তাঁহার সময়ে তিনি না কি কলিকাতায় সব চেয়ে ধনী ছিলেন। আমি তাঁহার প্রপৌত্র দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যে তাঁহার জমিদারিতে বৎসরে বার লক্ষ টাকা আয় ছিল, এবং সেই জমিদারি এখন থাকিলে, তাহার আয় বৎসরে ষাট্ লক্ষ টাকা হইত। কি ঐশ্বর্য্য!

দ্বারকানাথ বিলাতে গেলেন এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

পুত্র দেবেন্দ্রনাথের হস্তে এই সমস্ত বিষয় আসিল। প্রায় সব ধনীরই যেমন সম্পত্তি থাকে তেমন ঋণও থাকে। দ্বারকানাথ এত বড় সম্পত্তি রাখিয়া গেলেন, তার সঙ্গে প্রায় আশী লক্ষ টাকা ঋণও রাখিয়া গেলেন। মহা বিপদ্! ঋণ শোধ করিতে গেলে আর কিছুই থাকে না। আত্মীয় বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি বল, আমি কিছু ধারি না! সুশীল, সত্যনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, কখনই না, আমি সত্যের পূজক হইয়া কখনই মিথ্যা বলিতে পারিব না, সমস্ত ঋণ স্বীকার করিব, তাহাতে যদি আমার সামান্য চাকরি করিয়াও খাইতে হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি সত্যকে পরিত্যাগ করিব না!

তারপর যেখানে যে জমিদারি ছিল, এবং যে সকল ধন রত্ন ছিল সমস্তের তালিকা করিয়া মহাজনদিগকে দিয়া বলিলেন, আমি আমার পিতার ঋণ পরিশোধ করিবই করিব। আপনারা হয় আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আপনাদের টাকা নিন, না হয় আমার উপর জমিদারির ভার দিন, আমি আপনাদের ভৃত্যের ন্যায় জমিদারি চালাইব, আমাকে মাসে যৎ কিঞ্চিৎ দিবেন, বাকি সমস্ত আয় আপনাদের ঋণশোধে যাইবে! মহাজনেরা দেবেন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, দেবেন্দ্র! তোমার জমিদারি তোমারই রহিল, তুমি চালাও, ক্রমে ক্রমে যতদিনে পার আমাদের টাকা দিও।

দেবেন্দ্র তাঁহার ও পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য একশ ঐ পঁচিশ টাকা মাত্র লইতেন, এবং খরচবাদে যাহা আয় হইত, সবই মহাজনদিগকে দিতেন। কিছুদিন এইরূপ চলিল। তারপর তিনি যখন দেখিলেন, যে এ উপায়ে ঋণশোধ হইবার নহে, তখন জমিদারি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি, অলঙ্কারাদি বেচিয়া সমস্ত ঋণ পরিষ্কার করিলেন, তাঁহার নিজের আর কিছুই রহিল না। দীপেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, যে এখন যাহা কিছু

জমিদারি আছে তাহা দ্বারকানাথ তাঁহার পৌত্রদের নামে করিয়া গিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ এরূপ স্বার্থত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা বোধ হয় আর কখনও দেখে নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেই যুবা বয়সে যে প্রাণ দিয়া সত্যকে ধরিয়াছিলেন, সত্যের জন্য পৃথিবীর ধন সম্পদ্ সকলই ছাড়িয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি আজ সকলের পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইয়াছেন! সত্যের চেয়ে ভাল আর কি আছে?

এ গুলি আবার কেন?

সুশীল। বাবা, এত গাছ পালা কেন? এ গুলি ভারি আপদ্। চলিতে গেলে গায়ে লাগে, সময় সময় হাওয়া বন্ধ করে, আরও কত অসুবিধা জন্মায়। এ গুলি না থাকিলে কি কোন ক্ষতি হইত?

বাবা। অমন কথা বল না, সুশীল; গাছের দ্বারা অনেক কাজ হয়। দেখ, গাছ পালা সব জীবের আহার। আমরা যাহা কিছু খাই, সবই গাছ হইতে উৎপন্ন, কেবল লবণ খনিতে জন্মে, আর ঘি, দুধ, মাখম প্রভৃতি গো মহিষাদির নিকট পাই: কিন্তু এই সকল জন্তু আবার গাছ পালা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। চাল, গম, ছোলা, মটর, গুড় চিনি—ইবাদ গাছ থেকে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গাছ না থাকিলে জীব জন্তু একেবারেই থাকিত না। গাছ থেকে কাঠ হয়, কাঠ হইতে ঘর হয়, নৌকা হয়, জাহাজ হয়, আরও কত কি হয়! গাছ আছে বলিয়া ভূপৃষ্ঠ সূর্য্যকিরণে একেবারে শুকাইয়া যাইতে পারে না, এবং রাত্রিকালে অতি শীঘ্র তাপ বাহির হইয়া গিয়া অতিশয় ঠাণ্ডাও হইতে পারে না।

তারপর গাছ বায়ু পরিষ্কার করে। আমরা প্রশ্বাসের দ্বারা সর্ব্বদা অঙ্গারক বায়ু চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপ করিতেছি। গাছ সকল সেই প্রাণ নাশক অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে জীবনপ্রদ অম্লজান বায়ু ফিরাইয়া দিতেছে। দয়াময় পিতা আমাদের জীবন রক্ষার জন্য কি আশ্চর্য্য বন্দোবস্তই করিয়াছেন !

পা দিয়া খাওয়া।

বাবা। দেখ, সুশীল, আমরা ত মুখ দিয়া খাই, গাছ কিন্তু পা দিয়া খায়।

সুশীল। সে কি রকম, বাবা ?

বাবা। আমরা পায়ের উপর দাঁড়াই, গাছ শিকড়ের উপর দাঁড়ায়, অর্থাৎ শিকড়গুলি শক্ত করিয়া মাটিকে ধরিয়া থাকে বলিয়াই গাছ দাঁড়াইয়া আছে, নতুবা এক মুহূর্ত্তও মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে পারিত না। এই শিকড়গুলিকেই গাছের পা বলা যায়। অবশ্য সেগুলি দেখিতে পায়ের মত নয়, কিন্তু তাহাদের কাজ কতকটা পায়ের মত। একটা প্রভেদ এই যে, পা চলে, শিকড় চলে না, সেই জন্য গাছও অচল। তুমি যদি একটা প্রকাণ্ড বট গাছকে চলিয়া আসিতে দেখিতে, তাহা হইলে তোমার কতই না বিস্ময় জন্মিত !

সুশীল। হাঁ, বাবা, তাহা হইলে আমি ত ভয়ে অজ্ঞান হইয়াই পড়িতাম, মনে করিতাম, এটা নিশ্চয়ই ভূতের কাণ্ড।

বাবা। বটে, তুমি ভূতের কথা কোথায় শুনিলে ?

সুশীল। কেন, ঠাকুর মা আমাকে বলিয়াছেন, যে ভূত আছে।

আমাদের বাড়ীর বড় আম গাছে না কি একটা থাকে। তার পা দুখানা না কি তাল গাছের মত লম্বা, আর তার হাঁ টা না কি ঐ পুকুরটার মত বড়।

বাবা। সুশীল, তোমার ঠাকুর মা কি সেটাকে কখনও দেখিয়াছেন ?

সুশীল। না, বাবা; তিনি বলেন, যে গোয়ালা বুড়ী তাঁহাকে বলিয়াছে।

বাবা। ভূতের কথা সকলেই বলে, কিন্তু কেহই কখন দেখে নাই, বস্তুতঃ ভূত নাই। মেয়েরা ছেলে দিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কেবল ভূত কল্পনা করে। ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়; ছেলেরা ভয় পাইতে পাইতে ক্রমে ভীরু হইয়া যায়। শেষকালে একটা ইন্দুর নড়িলেও মনে করে, ভূত আসিয়াছে, আর চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া পালায়।

গাছ ঐ শিকড় দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে, আর সেই রস গাছের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ মূল হইতে শাখায়, প্রশাখায়, পত্রে পত্রে গিয়াছে তাহা দ্বারা বৃক্ষের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষদেহকে পোষণ করে ও বাঁচাইয়া রাখে। সেই জন্য শিকড় কাটিয়া দিলে গাছ আর বাঁচে না, একেবারে শুকাইয়া যায়। আমাদের দেহে যেমন শিরা দ্বারা রক্ত সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া দেহকে পোষণ করিতেছে, বৃক্ষদেহে এই সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ সকলও তাহাই করিতেছে। দেখিলে মনে হয়, প্রকৃতির সর্ব্বত্রই জীবন রক্ষার একই প্রণালী, কোথাও বা একটু সরল, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত একটু জটিল।

তাহা হইলেই দেখ, গাছ, পা অর্থাৎ শিকড় দিয়া খায়, অর্থাৎ রসপান করে। এই জন্যই গাছের আর একটী নাম পাদপ।

সুশীল। একেই বলে পা দিয়া খাওয়া ? আচ্ছা, বাবা, গাছের আমাদের মত মুখ নাই কেন ?

বাবা। ঈশ্বর যে পদার্থকে যেমন করিয়াছেন, সে পদার্থ সেইরূপই হইয়াছে। গাছকে মুখ দেন নাই, তাই গাছের মুখ নাই। কিন্তু যাহার যাহা চাই, তাহাকে তাহা দিয়াছেন! কি সুন্দর ব্যবস্থা!

যথার্থ আপন।

কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান
বাঁশের মাচাটি তার পুষ্পক বিমান।
ভুলেও মাটির পানে তাকয়না তাই,
চন্দ্র সূর্য্য তারকারে করে ভাই ভাই!
নভশ্চর বলে তার মনের বিশ্বাস;
শূন্য পানে চেয়ে তাই ছাড়ে সে নিশ্বাস।
ভাবে শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে,
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা ডোরে।
বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে
উড়ে যায় আপনার জ্যোতির্ম্ময় লোকে।
বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য্য তার কেউ নয়, সবি তার মাটি!

কোন্ রাজ্য ?



একবার এক রাজা কোন স্কুল দেখিতে গেলেন। স্কুলটি মেয়েদের। অনেক ছোট ছোট মেয়ে স্কুলে পড়িত, স্কুলে অনেকগুলি ক্লাসও ছিল। রাজা একে একে সব ক্লাসই দেখিলেন, এবং অবশেষে এক ক্লাসে যাইয়া শিক্ষক মহাশয়কে বলিলেন, মহাশয়! আমি মেয়েদিগকে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, হাঁ, মহারাজ! পারেন বই কি। রাজা তখন একটা কমলা লেবু হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কোন্ রাজ্যের মধ্যে? একটি বালিকা দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, ওটা উদ্ভিদ্ রাজ্যের মধ্যে। তার পর রাজা পকেট হইতে একটা মোহর বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; এটা কোন্ রাজ্যের অন্তর্গত? বালিকা উত্তর করিল, ধাতুরাজ্যের অন্তর্গত রাজা। তখন নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি কোন্ রাজ্যের অন্তর্গত?

বালিকা তখন একটু ভাবিতে লাগিল। সে জানিত যে মানুষও এক প্রকার জন্তু, কিন্তু রাজা যে একটি জন্তু—একথা তাহার মুখদিয়া বাহির হইল না। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, দেবরাজ্যের অন্তর্গত, মহারাজ! বালিকার উত্তর শুনিয়া রাজার চক্ষে জল আসিল। তিনি মেয়েটির মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, ঈশ্বর করুন, আমি যেন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ও রাজার কর্ত্তব্য পালন করিয়া সেই রাজ্যের উপযুক্ত হইতে পারি।

সুশীল। উদ্ভিদ্ রাজ্য কাহাকে বলে, বাবা?

বাবা। যত গাছ পালা, তৃণ গুল্মাদি দেখিতেছ, সবই উদ্ভিদ্ রাজ্য। রাজ্য মানে প্রকৃতির একটা ভাগ। সেইরূপ সোণা, রুপা, লোহা প্রভৃতি সব ধাতুই ধাতুরাজ্যের অন্তর্গত।

সুশীল। দেবরাজ্য কাহাকে বলে, বাবা?

বাবা। যাঁহাদের চিন্তা পবিত্র, কার্য্য পবিত্র, যাঁহারা সকলকেই ভাল বাসেন এবং যতদূর পারেন অপরের উপকার করেন ও নিজে যাহা উচিত মনে করেন, তাহাই করেন, তাঁহারাই দেবরাজ্যের লোক।

সুশীল। রাজা চক্ষের জল ফেলিলেন কেন?

বাবা। তাঁহার মনে হইল, যে তাঁহার অনেক ত্রুটি আছে, রাজার যে সব কার্য্য তাহা তিনি ভাল করিয়া করিতে পারেন না; সেই জন্য তাঁহার মনে দুঃখ হইল, আর তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিজের কাজটা ভাল করিয়া করিতে না পারিলে মনে কষ্ট হয় না কি?

সুশীল। হাঁ, বাবা, হয় বই কি; আমার যেদিন পড়া না হয়, সে দিন মন ভারি খারাপ থাকে, কিছুই ভাল লাগে না।

বাবা। তবেই দেখ, মনের সুখ চাও ত নিজের কাজটা ভাল করিয়া কর।

বড় গরম !

বড় গরম ! ভারি গরম ! ঠাণ্ডা সরবৎ আনো !
হাত পা কেমন করছে ছন্ ছন্ ! জোরে পাখা টানো !

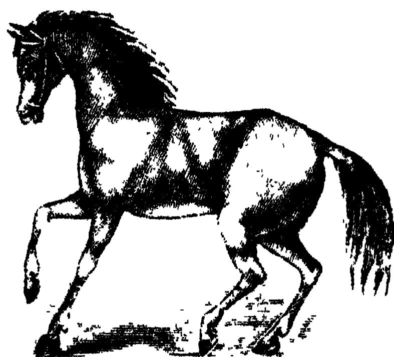
খালে বিলে নাইরে জল, সব শুকিয়ে গেল।
তাতে মাটি, ফাটে কাঠ, গ্রীষ্ম ঐরে এল !
নৌকা নাহি চলে আর ; হায়রে টানাটানি !
মাঝি মাল্লা বলে 'আল্লা গাঙ্গে নাইক পানি !'

বুনো হাঁস বলে 'মোর মাথা গেল তেতে।
এই বেলা সেই ঠাণ্ডা দেশে পালাই উত্তরেতে।'
মহিষ গরু যত ছিল গেল রোগা হ'য়ে।
দেশে নাহি মিলে ঘাস, বাঁচে কিবা খেয়ে !

ঠাণ্ডা মাটি আগুন হ'ল তেতে গেল হাওয়া।
ঘরে ব'সে রাখি প্রাণ, রৈল পথে যাওয়া !
হাঁ করিয়া থাকে শালিক ব'সে মনোদুখে।
শুকায়েছে গলা তার, কথা নাহি মুখে !

গ্রীষ্মে লোকে বলে 'ভাই তুমি কেন এলে ?'
গ্রীষ্ম বলে 'এনু তাই আম খেতে পেলে !'
দুটো মাস থাক ভাই গরমের স'য়ে।
ফল শস্য পাকে যদি খাবে খুসী হ'য়ে !'

ওটা কি চরিতেছে !



বাবা। সুশীল, ওটা কি চরিতেছে বল ত ?

সুশীল। কেন, ওটা একটা ঘোড়া।

বাবা। ওটা কার ঘোড়া ?

সুশীল। আমি বলিতে পারি না ; পূর্ব্বে আর কখনও উহাকে দেখি নাই।

বাবা। তাহা হইলে তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে ওটা ঘোড়া ?

সুশীল। ওটা দেখিতে যে অন্যান্য ঘোড়ার মত।

বাবা। তাহা হইলে সব ঘোড়াই দেখিতে একই রকম ?

সুশীল। হাঁ।

বাবা। তাই যদি হয়, তবে একটা ঘোড়া যে অপর একটা নয়, তাহা কেমন করিয়া জানিতে পার ?

সুশীল। সব ঘোড়াই দেখিতে ঠিক এক রকম নহে।

বাবা। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এতটা সাদৃশ্য আছে যে অন্যান্য জন্তুর সহিত তাহাদের প্রভেদ সহজেই বুঝা যায়।

সুশীল। হাঁ, তাই ত।

বাবা। ঐ পেয়ারা গাছটা যে ঘোড়া নয় তাহাও তুমি জানিতে পার?

সুশীল। সে কি, বাবা! ঘোড়ার সঙ্গে আর পেয়ারা গাছের সঙ্গে কি তুলনা হয়। যাহাহউক, উহারা যে ভিন্ন তাহা আমি বুঝিতে পারি।

বাবা। বেশ! তুমি কি করিয়া জানিতে পার যে গাছ আর ঘোড়া বিভিন্ন!

সুশীল। কেন, ঘোড়া জীবিত।

বাবা। সমস্ত জীবিত পদার্থকে কি বলে?

সুশীল। বোধ হয়, জীব বলে।

বাবা। তুমি বলিতে পার কি, গাছেতে আর ঘোড়াতে কোন বিষয়ে ঐক্য আছে কিনা?

সুশীল। আমার মনে হয় না।

বাবা। হাঁ, সুশীল, এক বিষয়ে ক্ষুদ্রতম তৃণ ও শ্রেষ্ঠতম মানবের মধ্যেও ঐক্য আছে।

সুশীল। সেটা বোধ হয় এই যে, ঈশ্বর তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাবা। ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে কি বলা যায়?

সুশীল। সৃষ্ট পদার্থ।

বাবা। ঘোড়া তাহা হইলে এমন একটা সৃষ্ট পদার্থ যাহার জীবন আছে অর্থাৎ ঘোড়া একটা জীব।

সুশীল। তাহা হইলে গাছ একটা মৃত সৃষ্ট পদার্থ।

বাবা। না, না, যাহার কখনও জীবন ছিল না সে আবার মরিবে কি? জীবন ত্যাগ করার নামই ত মরা।

সুশীল। যাহা জীবিতও নয় মৃতও নয়, তাহাকে তবে কি বলা যায়?

বাবা। কেন, নির্জীব পদার্থ বল। নির্জীব ও সজীব দুই রকম পদার্থ

আছে। গাছ, পাথর, ধাতু প্রভৃতি নির্জ্জীব, আর মানুষ, ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি সজীব।

সুশীল। কিন্তু সেদিন মালি আমাকে বলিতেছিল, যে বাগানে কয়েকটি গাছ মরিয়া গিয়াছে, আর সবই বাঁচিয়া আছে। তবেত গাছও সজীব।

বাবা। ঠিক কথা। গাছেরও জীবন আছে, বৃদ্ধি ক্ষয় আছে, তাহারাও জন্ম মৃত্যুর অধীন। এবিষয়ে তাহারা জন্তুর সঙ্গে সমান। কিন্তু তাহাদের চেতনা নাই, জন্তুদের চেতনা আছে। এই প্রভেদ।

সুশীল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, চল এখন বাড়ী যাই।

অকর্ম্মার বিভ্রাট।

লাঙ্গল কাঁদিয়ে বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,—
তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা!
যে দিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেই দিন হতে মোর এত ঘোরাঘুরি!
ফলা কহে—ভাল ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কি আরামে থাক ঘরে বসে!
ফলাখানা টুটে গেল, হলখানা তাই
খুসি হয়ে পড়ে থাকে, কোন কর্ম্ম নাই।
চাষা বলে এ আপদ আর কেন রাখা,
এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।
হল বলে—ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে,
খাটুনি যে ভাল ছিল জলুনির চেয়ে!



সন্ধ্যা।

বাবা। সুশীল, সন্ধ্যা হইল, বাড়ী চল। ঐ সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিমাকাশ রক্ত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। পক্ষী সকল বাসায় যাইতেছে। মক্ষিকাকুল চাকে ফিরিয়া গিয়াছে। গো মহিষাদি পশুগণ আর মাঠে নাই। কৃষকগণ বাড়ী গিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ নীরব। পরম পিতা পরমেশ্বর যেন তাঁহার সন্তান দিগকে বিশ্রামের জন্য আহ্বান করিতেছেন

থেমে গেছে কোলাহল ফিরে আসে পাখিদল
বাতাস হয়েছে শান্ত অতি,
তরুগুলি মৃদুস্বরে শ্রান্ত দেহ নুয়ে পড়ে
গাহিতেছে বিশ্রামের গীতি।

বিধাতা নির্দ্দেশ বশে সমস্ত দিবস শেষে
অস্ত যায় সাঁঝের তপন,
নূতন কিরণ ধীরে অন্যেক জগত ঘিরে
আনিবারে নব জাগরণ।

পথ হয় নিরজন গেয়ে যায় পান্থজন
দূরিবারে পথের শ্রমত,
দূর হতে ধীরে ধীরে মৃদুল কিরণ ধারে
তারা গুলি ঢালে শান্তি গান।

হয়ে আসে সুনীরব নগর প্রান্তর সব
মাঝে মাঝে ডাকে শুধু দূরে,
জাগ্রত প্রহরী মত ফেরুপাল শত শত
সন্ধ্যাটির সম্ভাষণ সুরে।

সন্ধ্যা হয় ঘনীভূত সর্ব্বজীব গৃহাগত
বিধাতার প্রেরিত মতন,
নিদ্রা আসি পশি গায় ঢুলাইছে সবাকায়
স্নেহ তাঁর করিয়া জ্ঞাপন।

আর একটি কথা।

বাবা। সুশীল, সে দিন তোমাকে দ্বীপের কথা বলিয়াছিলাম, মনে আছে ত?

সুশীল। হঁ, বাবা, আছে।

বাবা। সেই পাথরগুলি ও থালাখান আবার লইয়া আইস। পৃথিবীতে কোন জিনিষই ফেলা যায় না; দেখ এই সামান্য পাথরগুলি তোমার কত কাজে লাগিতেছে! যত্ন করিয়া রাখিলে সব জিনিষই কখনও না কখনও কিছু উপকার করেই।

সুশীল। বাবা, এই ত পাথরগুলি আনিয়াছি, কি করিতে হইবে?

বাবা। ওগুলিকে থাল খানার এক কিনারা হইতে ক্রমে সরু করিয়া সাজাইয়া যাও, ঠিক যেন ত্রিকোণ হয়, এবং থালার মধ্যস্থলে যেন এক কোণ থাকে।

সুশীল। হইয়াছে, বাবা। তারপর কি করিতে হইবে?

বাবা। তারপর থালার জল ঢালিয়া দেও। কি হইল?

সুশীল। সাজান পাথরগুলির তিন দিকেই জল হইল, কেবল এক দিকে জল গেল না।

বাবা। মনে কর, তোমার সাজান পাথরগুলি যেন একটা ভূমিখণ্ড, আর তোমার থালার জলাংশ যেন সমুদ্র। তাহা হইলে এই ভূখণ্ডকে কি বলা যাইতে পারে?

সুশীল। আমি ত ভূগোলে পড়িয়াছি, যে ভূভাগের তিনদিকে জল, তাহার নাম উপদ্বীপ; তবে কি, বাবা, এটা উপদ্বীপ হইল?

বাবা। হাঁ, সুশীল, এটা উপদ্বীপই হইল।

মনে কর আমরা কলিকাতার কয়লা ঘাটে একখানি নৌকায় উঠিয়া দক্ষিণ মুখে চলিলাম। কয়েক দিন পর্য্যন্ত নৌকা ক্রমাগত চালাইয়া একটা জায়গায় উপস্থিত হইলাম, সেখানে কেবল একদিকে স্থল দেখা যাইতেছে, অপর তিন দিকে কেবল সুনীল জলরাশি ধু ধু করিতেছে। বলত কোথায় আসিলাম?

সুশীল। কেন, সাগরসঙ্গমে। হুগলী নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে কি না।

বাবা। মনে কর তার পর আমরা একখানা ষ্টীমারে উঠিয়া কূলের নিকট দিয়া চলিলাম। ক্রমে উড়িষ্যার উপকূল দিয়া যাইতে যাইতে সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, ও মহানদীর মোহনা পার হইয়া পুরী বা শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন রাত্রি কেবল প্রভাত হইয়াছে, সমুদ্রের গর্ভ হইতে আস্তে আস্তে সূর্য্য উঠিতেছে, আর অনন্ত বারিধির বিশাল বক্ষ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ ধারণ করিতেছে, পশ্চিমে জগন্নাথের মন্দির ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। আবার ষ্টীমার চলিল, ক্রমে মান্দ্রাজের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টীমার বাষ্পবেগে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর মোহান অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেতুবন্ধে আসিয়া উপনীত হইল। এই সেতুবন্ধের কথা তুমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। সেখান হইতে কুমারিকা অন্তরীপে আসিয়া মালবার উপকূলের নিকট দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, এবং আরব সাগর দিয়া চলিতে চলিতে বোম্বাই অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানে দেখি সমুদ্র স্থলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আর পুণ্যসলিলা তাপ্তী ও নর্ম্মদা

আসিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। তারপর সিন্ধুর দিয়া আর যাইতে পারিলাম না, কারণ আর জল নাই। যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের তীরের নিকট দিয়া চলিতে চলিতে আমরা কাম্বে উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ইহাকে কি বলা যাইতে পারে ?

সুশীল। বাবা, এটা ত আমার থালার উপদ্বীপেরই মত ; তবে এটা পদ্বীপ : নয় কি, বাবা ?

বাবা। হাঁ, সুশীল, ভারতের দক্ষিণাংশ, যাহাকে দাক্ষিণাত্য বলা যায়, সেটা একটা উপদ্বীপ।

চারিটা পেট।

বাবা। সুশীল, কোন কোন জন্তুর চারিটা পেট আছে।

সুশীল। বলেন কি বাবা? আমরা যে একটা পেটের জ্বালায়ই অস্থির।

বাবা। তাহাতে কি ? যাহার যাহা দরকার ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন।

সুশীল। কোন্ কোন্ জীবের চারিটা পেট, বাবা ?



বাবা। গোরু, ছাগল, ভেড়া ও হরিণ।

সুশীল। এত পেট দিয়া উহারা কি করে ?

বাবা। উহারা ঘাস খাইলে প্রথমতঃ একটা পেটে যায়, এবং সেটা পূর্ণ হইলে উহারা শয়ন করিয়া রোমন্থন করে।

সুশীল। সে আবার কি, বাবা ?

বাবা। ঘাসগুলি প্রথম পেট হইতে দ্বিতীয় পেটে যায়, এবং সেখানে জড়াইয়া জড়াইয়া বলের মত হইয়া যায়। এই বলগুলি একটা একটা করিয়া পুনরায় মুখে উঠিয়া আইসে। জন্তুটা সেগুলি আবার চিবাইয়া থাকে। ইহাকেই বলে রোমন্থন করা। বেশ করিয়া চিবাইয়া জন্তুটা ঘাসগুলি আবার গিলিয়া ফেলে, তখন সেই ঘাস তৃতীয় পেটে যায় এবং সেখান হইতে চতুর্থ পেটে যাইয়া হজম হয়।

সূর্য্যের কথা।

বাবা। সুশীল, তোমাকে ইতিপূর্ব্বেই সূর্য্যের কথা কিছু বলিয়াছি, আরও কিছু বলিতেছি শুন।

আমি তোমাকে সে দিন বলিয়াছিলাম, সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দ লক্ষগুণ বড় এবং আমাদের পৃথিবী হইতে ৯ কোটী মাইলের ও অধিক দূরে অবস্থিত। এখন তোমার জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে, সূর্য্য কিরূপ পদার্থ।

সুশীল। হাঁ, বাবা, বলুন ত সূর্য্য কিরূপ পদার্থ!

বাবা। সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড অগ্নিময় পদার্থ। লোহকে তাপ দিলে ক্রমে গলিয়া যায়, তাহা তুমি দেখিয়াছ। এরূপ গলিত ধাতু যদি ক্রমাগত অচিন্তনীয় বেগে ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়! সূর্য্যও এইরূপ এক অতি বৃহৎ গলিত ধাতু পিণ্ড, ক্রমাগত অচিন্তনীয় বেগে ঘুরিতেছে। তোমরা বোধ হয় দূরবীক্ষণের নাম শুনিয়াছ। এই যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিলে দূরের বস্তুকে নিকট দেখায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে দেখা যাইবে যে, সূর্য্যের গায়ে বড় বড় কাল

কাল দাগ আছে, ইহাদের এক একটা এত বড় যে, আটটা দশটা পৃথিবীকে উহার ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আজ সূর্য্যের একটা দাগ দেখিয়া রাখ, এক দিন কি দুই দিন পরে আবার নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, সেটা পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে, বার দিন পরে দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, সে দাগটা আবার পূর্ব্ব দিকে আসিয়াছে, এবং পচিশ দিন পরে দেখা যাইবে যে, দাগটাকে প্রথমে যে স্থানে দেখা গিয়াছিল, সেটা আবার সেই স্থানে আসিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। আমরা যে গোলাকার সূর্য্য দেখিতে পাই উহাই সূর্য্যের সব নহে, জ্বলন্ত বাষ্পরাশি সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপিয়া সূর্য্যকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সচরাচর আমরা এই বাষ্প দেখিতে পাই না, কিন্তু সূর্য্য গ্রহণের সময় দেখিতে পাই। তখন এই উজ্জ্বল বাষ্পরাশি অতি সুন্দর দেখায়।

তুমি শুনিলে হয়ত অবাক্ হইয়া যাইবে যে, সূর্য্য যে যে জিনিসের দ্বারা গঠিত তাহাও স্থির করা হইয়াছে!

সুশীল। তাই নাকি, বাবা; সূর্য্য অত দূরে, এখান হইতে সূর্য্য কি কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কি প্রকারে ঠিক হইল?

বাবা। তবে মন দিয়া শুন, আমি বলিতেছি। ব্যাপারটা তোমার কাছে যত বিস্ময়কর বোধ হইতেছে, বাস্তবিক তত বিস্ময়কর নহে! একটা ঝাড়ের কলম রৌদ্রে ধরিলে সাতটা রঙ দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহ আগুনে গলাইলে এই সাত রঙের এক রঙ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, যে সূর্য্যে লৌহ আছে। এইরূপে সূর্য্যের অন্যান্য ধাতুও নিরূপিত হইয়াছে!

সূর্য্যাস্ত।

সুশীল। আপনি আমায় মাঠে বলিয়াছিলেন, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। অস্ত যাওয়ার অর্থ কি, বাবা?

বাবা। ইহার অর্থ এই যে, সূর্য্য আমাদের দৃষ্টি রেখার নিম্নে চলিয়া গেল।

সুশীল। দৃষ্টি রেখা কাহাকে বলে?

বাবা। কোন উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে, যে রেখায় আকাশ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাই দৃষ্টি রেখা।

সুশীল। এত অল্প দূর যাইতে সূর্য্যের এত অধিক সময় লাগে?

বাবা। সূর্য্য ত আর যায় না, সূর্য্য স্থির।

সুশীল। না বাবা, তাহা কখনও নহে। আমি রোজ দেখি সূর্য্য সকালে থাকে পূর্ব্বে আর সন্ধ্যায় যায় পশ্চিমে, তবুও কেমন করিয়া বিশ্বাস করি, যে সূর্য্য স্থির?

বাবা। ট্রেণে যাইতে যাইতে গাড়ীর জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিলে মনে হয়, যেন গাড়ী স্থির আর গ্রাম গুলি দ্রুত বেগে পিছনের দিকে ছুটিতেছে। বাস্তবিকই কি তাই?

সুশীল। না, বাবা, ঐরূপ বোধ হয় মাত্র।

বাবা। সূর্য্যের সম্বন্ধেও সেই কথা।

সুশীল। আচ্ছা, পৃথিবী যে ঘুরিতেছে তাহা কিরূপে বুঝিব?

বাবা। কেন দিবা রাত্র হইতে। এখনই তোমাকে দেখাইতেছি, কেমন করিয়া হয়। তোমার ঘরের জানালা দরজা বন্ধ কর। আলোটা জ্বাল। আলোটাকে টেবিলের উপর রাখ। তোমার বড় বলটা আনিয়া

তাহার একস্থানে কলিকাতা লিখিয়া দাও। তারপর বলটাকে আলোর সহিত সমসূত্রে ধরিয়া ঘুরাও। কি হইতেছে?



সুশীল। কলিকাতা কখনও আলোতে আসিতেছে কখনও আঁধারে যাইতেছে।

বাবা। মনে কর আলোটা সূর্য্য, আর বলটা পৃথিবী। তাহা হইলে কলিকাতা যখন আলোতে আসিতেছে, তখন আমাদের দিন। আর যখন আঁধারে যাইতেছে, তখন আমাদের রাত্রি। বুঝিলে সুশীল?

সুশীল। একটু একটু বুঝিয়াছি, বাবা।

বাবা। আচ্ছা, বলত কলিকাতা একবার আলোতে ও একবার অন্ধকারে থাকে কেন? তুমি যদি বলটা না ঘুরাইতে, তাহা হইলে এরূপ হইত কি?

সুশীল। না কখনই না।

বাবা। তাহা হইলে ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে?

সুশীল। সূর্য্য স্থির, আর পৃথিবী ঘুরিতেছে।

বাতাসের কথা।

সুশীল। বাবা, কেমন সুন্দর বাতাস আসিতেছে! এক একবার হাওয়া গায়ে লাগিতেছে, আর শরীর জুড়াইয়া যাইতেছে! এই গরমে যদি হাওয়া না থাকিত, তাহা হইলে কতই কষ্ট হইত! বাতাস কি সব সময়েই আছে, বাবা?

বাবা। হাঁ, সুশীল, বাতাস সব সময়েই আছে এবং সব জায়গায়ই আছে, এমন কি জলের ভিতরে পর্য্যন্ত বাতাস আছে। যখন আমরা বলি "উঃ! একটুকুও হাওয়া নাই, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না," তখনও হাওয়া থাকে, কেবল গতি অতি মন্দ বলিয়া অনুভব করি না, এই মাত্র।

সুশীল। তাহা হইলে যখন বাতাসের গতি হয়, তখনই আমরা উহা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি?

বাবা। তাহা কেন, আমরা ত প্রতি মুহূর্ত্তেই নিশ্বাসের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করিতেছি, সুতরাং বুঝিতে পারিতেছি যে বায়ু সর্ব্বদাই আমাদিগের নিকটে আছে, আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে, আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া আছে। যে জিনিষটার আমাদের যত প্রয়োজন, ঈশ্বর তাহা আমাদের তত নিকটে রাখিয়াছেন!

সুশীল। বায়ু কি এতই প্রয়োজনীয় যে সর্ব্বদাই আমাদের কাছে আছে এবং আমরা অনায়াসে উহা পাইতেছি?

বাবা। হাঁ, সুশীল, আমাদের জীবন রক্ষার জন্য বায়ুর যেমন প্রয়োজন, এমন আর কিছুরই নহে। পাঁচ মিনিট যদি বায়ু না থাকে, তাহা হইলেই সমস্ত জীব জন্তু মরিয়া যায়!

সুশীল। কেন, বাবা, বায়ুর সঙ্গে জীবনের এমন কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে?

বাবা। দুইটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে বায়ুর উৎপত্তি,—অম্লজান ও যবক্ষারযান।

সুশীল। মৌলিক পদার্থ কাহাকে বলে, বাবা?

বাবা। যে যে পদার্থ অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন নহে, এবং যাহাদের দুই কিম্বা ততোধিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া কোন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তাহাকে মৌলিক পদার্থ বলে। অম্লজান ও যবক্ষারজানের মিশ্রণে বায়ুর উৎপত্তি, কিন্তু উহারা নিজে অপর কোন পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় নাই, সেই জন্য উহারা মৌলিক পদার্থ, আর উহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বায়ু মৌলিক পদার্থ নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাঁচটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—আকাশ, মাটি, জল, আগুন, বায়ু। এখন স্থির হইয়াছে যে, মাটী, জল, বায়ু মৌলিক পদার্থ নহে, এবং আকাশ কোন পদার্থই নহে, আর ভূত বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা পাঁচটি নহে, অন্ততঃ সত্তরটি।

বায়ুতে যে অম্লজান রহিয়াছে, উহা জীবন রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। নিশ্বাসের সঙ্গে অধিক পরিমাণে অম্লজান বাষ্প শরীরে প্রবেশ করিতেছে ও তাহার পরিবর্ত্তে দ্রাম্ল অঙ্গারক বাষ্প প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতেছে। কয়েক মিনিট যদি এই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ থাকে, তাহা হইলেই শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণনাশক দ্রাম্ল অঙ্গারক বাষ্প অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া জীবের জীবন শেষ করিয়া ফেলে।

বায়ু না থাকিলে আমরা কথা বলিতে পারিতাম না, কিছু শুনিতে পাইতাম না, কারণ আমরা যে কোন শব্দ উচ্চারণ করি, অথবা যে কোন শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা বায়ুরই কম্পন মাত্র। কোকিলের

মধুর রব, সঙ্গীতের মনোহর তান, শিশুর আধ আধ স্বর, মাতার অমৃতময়ী স্নেহবাণী—কিছুই বায়ু না থাকিলে সম্ভব হইত না !

তবেই দেখ বায়ু কত প্রয়োজনীয় !

ভালবাসা যদি থাকে ঘরে ।

আমাদের এ ধরণী কত ভাল লাগে
ভালবাসা যদি থাকে ঘরে ।
কি সঙ্গীত উঠে প্রাণে কি আনন্দ জাগে
ভালবাসা যদি থাকে ঘরে ।
কত নব নব সুখ, কি শান্তি মধুর,
শোক দুঃখ অন্ধকার হয়ে যায় দূর,
প্রাণ যেন ভরানদী সুখে ভরপুর,
ভালবাসা যদি থাকে ঘরে
জীবনের পথ যেন পুষ্প আস্তরণ,
ধরা হয় সুখময় শান্তির ভবন,
সকল অভাব ঘুচে সুখের জীবন,
ভালবাসা যদি থাকে ঘরে ।

ফুলের তোড়া।

কোন গ্রামে এক দরিদ্রা বিধবা বাস করিতেন। তাঁহার একটী মাত্র ছোট ছেলে ছিল। মার সংসারে আর কেহই ছিল না বলিয়া, তিনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "জীবন"। বিধবার কষ্টের সীমা ছিল না; গ্রামে ভদ্র লোকদিগের বাড়ীতে ধান ভানিয়া কিছু কিছু পাইতেন, তাহা দ্বারাই অতি কষ্টে শিশুটিকে খাওয়াইতেন এবং নিজে কোন ক্রমে কোন দিন অনাহারে কোন দিন বা অর্দ্ধাহারে কাল কাটাইতেন। কষ্ট সহিয়া সহিয়া তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু মুখের প্রসন্নতা কখনই যায় নাই। বরং লোকে এত দুঃখের মধ্যেও তাঁহার প্রসন্নতা দেখিয়া বিস্মিত হইত। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ তত অধিক ছিল না; ভালবাসা কিনা করিতে পারে? দুঃখে সুখ, কষ্টে আরাম, বিষাদে হর্ষ—এ সবই ভালবাসার পক্ষে সম্ভব! বিধবার অন্তরে ছেলেটির প্রতি যে গভীর ভালবাসা ছিল, তাহাতেই তাঁহাকে সদাই প্রসন্ন রাখিত!

একদিন প্রাতে বালকের জ্বর হইল, প্রথমে শরীর সামান্য গরম হইল, কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, শরীরের তাপও ততই বাড়িতে আরম্ভ করিল, শেষে ছেলেটি বিছানায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। দিন গেল, রাত্রি আসিল। সমস্ত রাত্রি মা সন্তানের শয্যার পাশে বসিয়া কাটাইলেন, মনে কতই অশুভ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল! বিধবা আপনাকে সম্পূর্ণ নিঃসহায় জানিয়া কেবল কাতর অন্তরে ঈশ্বরের নিকট পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "হে দুঃখীর বন্ধু পরমেশ্বর! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এই দুঃখিনীর সন্তানটির

প্রাণ ভিক্ষা দাও!” তিনি মনে মনে অনেক বার বলিলেন, “বাবা জীবন! ঐ যে তোমার কাপড় ঝুলিতেছে, তুমি কি আর উহা পরিবে না? ঐ যে তোমার পুস্তকগুলি রহিয়াছে, উহা কি তুমি আর পড়িবে না? এই দুঃখিনী মাকে কি তুমি ছাড়িয়া যাইবে?”

এই রূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে চিকিৎসক আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধটা বেশ কাজ করিল। বিকাল বেলা জ্বর কমিয়া গেল. কিন্তু তখন সে এত দুর্ব্বল যে পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না, হাত পা স্থির। মার মনে আশঙ্কা হইল, ছেলে বুঝি আর ভাল হইল না। এই রূপে দুই তিন দিন চলিল। ছেলেটি কখনও ছট ফট করে, কখনও স্থির হইয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। চতুর্থ দিন সকাল বেলা হঠাৎ কে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। দ্বার খুলিলে একজন চাকর বিধবার হস্তে একটা ফুলের তোড়া দিয়া বলিল, “জমীদার বাড়ীর গৃহিণী আপনার ছেলের জন্য এই তোড়াটি পাঠাইয়াছেন।” মা সেটি লইয়া জীবনের কাছে গিয়া বলিলেন, “বাবা, দেখ, তোমাকে জমিদার বাবুর স্ত্রী কি দিয়াছেন!”



ফুলগুলি দেখিতে দেখিতে বালকের চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, উহাদের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইল, এবং উহাদের উজ্জ্বল বর্ণে গৃহ যেন আলোকিত হইল। সে বলিল, "মা আমাকে বালিসে ঠেস দিয়া বসাইয়া দাও, আমি মালা গাঁথিব।" মা তাহাই করিলেন, ছেলেটি সমস্ত দিন ফুলগুলি লইয়া খেলা করিল, তাহার মনে কতই আনন্দ, কতই সুখ! সন্ধ্যাবেলা রোগী অনেকটা ভাল আছে দেখিয়া চিকিৎসক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি এক নূতন তত্ত্ব শিখিলেন—রোগীর মন প্রফুল্ল রাখিতে পারিলে অনেক সময়ে রোগের উপশম হয়। শরীর ও মনের এমনই নিকট সম্বন্ধ!

আর এক সপ্তাহের মধ্যেই ছেলেটি সম্পূর্ণ ভাল হইল, আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন হইতে তাহার একটি সুন্দর অভ্যাস হইয়া গেল। সে কোন ব্যক্তির ব্যারামের কথা শুনিলেই, কোন রকমে কতকগুলি ফুল যোগাড় করিয়া তোড়া বাঁধিয়া তাহাকে দিয়া আসিত।

ফলটি পড়িল কেন?

বাবা। সুশীল, আজ তোমাকে একজন বড় লোকের কথা বলিতেছি, শুন।

সুশীল। বড়লোক কাহাকে বলে, বাবা?

বাবা। যাঁহার মনটাও বড়, প্রাণটাও বড়, তিনিই বড় লোক। যিনি গভীর চিন্তাদ্বারা কোন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জন সাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যিনি প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পরহিত সাধনে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই বড় লোক।

ইংলণ্ড দেশে একজন বড় লোক জন্মিয়া ছিলেন, তাঁহার নাম নিউটন। তোমরা বড় হইয়া অনেক পুস্তকে তাঁহার কথা অনেক পড়িবে। এখন অল্প কিছু বলিতেছি। কোন বৃক্ষ হইতে একটি ফল পড়িতে দেখিয়া তিনি এক মহাসত্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

সুশীল। কেন, বাবা, উহা আর এমন আশ্চর্য্য কি? ফল পাকিলেইত পড়িয়া যায়।

বাবা। তা বটে, কিন্তু উহাতে তাঁহার মনে যে চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহাই জানিবার বিষয়।

সুশীল। তিনি কি ভাবিলেন?

বাবা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ফলটি পড়িল কেন?

সুশীল। কেন, আমি যদি তাঁহার নিকটে থাকিতাম, তাহা হইলে বলিতাম, এত ভাবিতেছেন কেন, মহাশয়? বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেল, আর ফলটি মাটিতে পড়িল, কারণ উহাকে ধরিয়া রাখিবার আর কিছুই ছিল না।

বাবা। তাহাত ঠিক, কিন্তু পড়িল কেন? উপরে উঠিয়া বা পাশে চলিয়া গেল না কেন?

সুশীল। ঊর্দ্ধে ধরিয়া রাখিবার যখন কিছুই রহিল না, তখন অবশ্যই মাটিতে পড়িবে।

বাবা। কেন পড়িবে?

সুশীল। না পড়িয়া থাকিতে পারে না।

বাবা। কেন পারে না?

সুশীল। আমি জানি না,—ওটা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন! ধরিয়া রাখিবার কিছু না থাকিলেই পড়িবে—ইহাত সহজেই বুঝা যায়।

বাবা। অবলম্বন না থাকিলে মাটিতে পড়িবে কেন?

সুশীল। হা নিশ্চয়ই পড়িবে।

বাবা। ফলটি সচেতন কি অচেতন ?

সুশীল। অচেতন।

বাবা। অচেতন পদার্থ কি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে ?

সুশীল। না ; কিন্তু বোধ হয়, ফলটার মাটির দিকে একটা টান্ ছিল, সেই জন্যই মাটিতে পড়িল।

বাবা। ঠিক কথা ! বাহিরের কোন শক্তি উহার উপর কার্য্য করিল বলিয়াই ফলটা পড়িল, নতুবা যেখানকার ফল সেই খানেই থাকিত।

সুশীল। তাই না কি ?

বাবা। অবশ্য। দুই কারণে ফলটার গতি হইতে পারিত, নিজশক্তি দ্বারা, অথবা অন্য কোন বস্তুর শক্তি দ্বারা। তুমিই বলিয়াছ, ফলটার গতি-শক্তি ছিল না, কারণ উহা অচেতন ; সুতরাং দ্বিতীয় কারণেই ফলটা পড়িয়াছিল। এই দ্বিতীয় কারণটা কি, তাহাই নিউটন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সুশীল। ধরিয়া রাখিবার কিছু না থাকিলে সব পদার্থই মাটিতে পড়িয়া যায়।

বাবা। ঠিক। তবেই এমন একটা কিছু আছে, যে জন্য সব পদার্থই আশ্রয় না থাকিলে মাটিতে পড়িয়া যায়।

সুশীল। সেটা কি, বাবা ?

বাবা। যদি পৃথিবীর বাহিরের পদার্থ আপনা আপনি পৃথিবীর দিকে আসিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথিবীই তাহাদিগকে টানিয়া আপনার দিকে লইয়া আইসে।

সুশীল। কিন্তু, বাবা, পৃথিবীও ত অচেতন, তবে টানিবে কিরূপে ?

বাবা। ঠিক ধরিয়াছ! নিউটন অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যে স্বভাবের একটা নিয়ম আছে, তাহার নাম আকর্ষণ। ইহার প্রভাবে প্রত্যেক জড় পরমাণু অন্যান্য জড় পরমাণুকে আয়তন ও দূরত্ব অনুসারে আপনার দিকে টানিতেছে। টেবিলের উপর দুইটি মার্ব্বেল রাখ। অন্যান্য বস্তুর আকর্ষণ বাধা না দিলে উহারা নিশ্চয়ই একত্র হইত। টেবিলের আকর্ষণ, ভূমির আকর্ষণ ও গৃহস্থিত অন্যান্য বস্তুর আকর্ষণ বাধা দিতেছে বলিয়াই মার্ব্বেল দুটি মিলিতে পারিতেছে না।

পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড বর্ত্তুল; নিকটবর্ত্তী আর কিছুরই সহিত ইহার তুলনা হয় না; সুতরাং পৃথিবী মহাশক্তিতে নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে; অতএব সব পদার্থই অবলম্বনহীন হইলে পৃথিবীর টানে পৃথিবীতেই আসিয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ। এই আকর্ষণ সততই পৃথিবীর মধ্যবিন্দু অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে।

এই মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, মহামতি নিউটন বুঝিতে পারিলেন, এই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই ফলটা মাটিতে পড়িয়াছিল। বুঝিলে সুশীল?

সুশীল। বুঝিয়াছি বাবা!

পূর্ব্ব কথা।

বাবা। সুশীল, আমরা সে দিন জাহাজে চড়িয়া কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম; তোমার মনে আছে কি?

সুশীল। হাঁ, বাবা, মনে আছে বই কি?

বাবা। এই কাম্বে উপসাগর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় গমন করিলে আরব সাগরে আসিয়া একটা নদের মোহনা পাওয়া যায়। সেই

স্থানে একখানা নৌকায় চড়িয়া ক্রমে উপরে উঠিয়া আসিলে, প্রথমতঃ সিন্ধু দেশের মধ্য দিয়া আসিতে হয়, তারপর পঞ্জাবের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এই নদের নাম সিন্ধু। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ ইহাকে সিন্ধুমাতা বলিতেন। পরবংশীয়েরা বোধ হয় সিন্ধুর প্রতাপ দেখিয়া তাহাকে পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, জলাশয়ের সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষভেদ কিছুই নহে, কবির কল্পনা মাত্র। সিন্ধু দিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে পাইবে, পাঁচটি নদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে,—শতদ্রু, বিপাসা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা। এই পাঁচটি নদী এদেশের ভূমিকে সিক্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়াই, ইহার নাম পঞ্জাব হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ মধ্য আশিয়া হইতে আসিয়া এই দেশেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন।

সুশীল। উপনিবেশ কাহাকে বলে, বাবা?

বাবা। এক দেশবাসী কতকগুলি লোকে অন্য দেশে আসিয়া কোন স্থানে বাস করিলে তাহাকে উপনিবেশ বলে। মনে কর কতকগুলি বাঙ্গালী গৃহস্থ ব্রহ্মদেশের কোন স্থানে যাইয়া বাস করিলেন; সেই স্থান হইবে তাহাদের উপনিবেশ।

সিন্ধুর মোহনা হইতে বরাবর তীরের নিকট দিয়া জাহাজ চালাইয়া গেলে ক্রমে একটা উপসাগরে উপনীত হইতে হয়; ইহার উত্তর তীরে পারস্য দেশ, দক্ষিণ তীরে আরব দেশ। পারস্যের পূর্ব্বভাগে আরাই নামে এক পাহাড় আছে। সেখানে অত্যন্ত শীত। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের নাম আর্য্য হইয়াছিল। তাঁহারা এই স্থান হইতে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া ইউরোপখণ্ডে যাইয়া বাস করেন। আধুনিক ইংরাজ ও জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতিগণ তাঁহাদেরই সন্তান। অপর শাখা হিন্দুকুশ

পর্ব্বত পার হইয়া পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন। ইহারা শ্বেতকায় ও সভ্য ছিলেন, এবং ক্রমে আদিম অসভ্য জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়া দেশে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিলেন, আর কৃষ্ণকায় অসভ্যগণ তাড়িত হইয়া বনে জঙ্গলে পাহাড়ে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। আধুনিক সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ তাহাদেরই সন্তান। কত সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবুও ইহারা সভ্যতার কোন আলোক প্রাপ্ত হয় নাই!

তদনন্তর আর্য্যগণ ক্রমশ অগ্রসর হইয়া কুরুক্ষেত্র (কর্ণওয়াল), পাঞ্চাল (রোহিলখণ্ড), মধ্য (জব্বলপুর), শূরসেন (মথুরা), কাশী, কোশল (অযোধ্যা), মগধ (দক্ষিণ বেহার), বিদেহ (উত্তর বেহার) এমন কি বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিলেন, অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহাদের অধিকারে আসিল। এই জন্যই ইহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত, অর্থাৎ যেখানে আর্য্যেরা বাস করেন।

তোমরা যদি কখনও মধুপুর যাইয়া থাক তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ যে, দূরে মেঘের ন্যায় একটা কি যেন ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে! এইটাই বিন্ধ্যাচল। এই বিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষকে স্বভাবতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে,—উত্তর ভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণ ভাগের নাম দাক্ষিণাত্য। পণ্ডিতেরা বলেন, যে এই দাক্ষিণাত্যেও আর্য্যগণ গমন করিয়াছিলেন।

সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিতেন, এবং এই স্থানকে অতি পবিত্র মনে করিতেন। অনেকে অনুমান করেন, এই স্থানেই জাতিভেদ সংগঠিত হইয়াছিল। এদেশে আসিবার পর আর্য্যদিগের শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হইল। সব সভ্যজাতির মধ্যেই শ্রমবিভাগ আছে; সকলেই যদি সকল কাজ করে, তাহা হইলে কোন

কাজেরই উন্নতি হয় না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ইহা বিশেষ রূপে অনুভব করিয়া আপনাদের মধ্যে একটা শ্রমবিভাগ করিয়া লইলেন। কতকগুলি যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়া রহিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন। ব্রহ্ম শব্দের একটা অর্থ বেদমন্ত্র। তখন লিখিবার প্রথা ছিল না, সুতরাং বেদমন্ত্রগুলি লোকের মুখে মুখেই থাকিত। যাঁহারা এই মন্ত্র সকল মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ ছিলেন। (ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদমন্ত্র যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ) ইহাদের মধ্যে আর কতকগুলি কৃষ্ণকায় অসভ্য-দিগের সহিত নিয়ত সংগ্রামে নিযুক্ত রহিলেন, সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। যাঁহারা কৃষি বাণিজ্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন। আর যে সকল কৃষ্ণকায় অসভ্যগণ আর্য্যদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহারা শূদ্র অর্থাৎ দাস হইল।

আর্য্যগণ যতই কৃষ্ণকায় শত্রুদিগকে পরাজিত ও অপসারিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন, এবং দিন দিন জ্ঞান ধর্ম্মে উৎকর্ষ লাভ করিয়া শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

জুতা আবিষ্কার।

কহিলা হবু "শুন গো গোবরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র—
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ ফেলা মাত্র!

তোমারা শুধু বেতন লহ বাঁটি
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি !
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি !
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর !”
শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম্ম বহে গাত্রে !
পণ্ডিতের হইল মুখ চুণ
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে !
রান্নাঘরে নাহিক চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়ীমধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,—
“যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কি উপায়ে !”
শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে “কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় কর ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব !
ধূলা-অভাবে না পেলে পদধূলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে !

আগের কাজ আগে ত তুমি সারো
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো !”
আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী !
বসিল সবে চসমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য,
অনেক ভেবে কহিল “গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য !”
কহিল রাজা “তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছে কেন তবে ?”
সকলে মিলি যুক্তি করে শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলো এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ !
ধূলায় কেহ মেলিতে নারে চোক,
ধূলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য্য ;
ধূলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধূলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, “করিতে ধূলা দূর,—
জগৎ হল ধূলায় ভর-পুর !”
তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক্ কাঁখে একুশলাখ ভিস্তি।

পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি ;
জলের জীব মরিল জল বিনা
ডাঙ্গার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা ;
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দ্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা !
কহিল রাজা "এমনি সব গাধা
ধূলারে মারি করিয়া দিল কাদা !"
আবার সবে ডাকিল পরামর্শে ;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত ;
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধূলার হায় নাহিক পায় অন্ত !
কহিল "মহী মাদুর দিয়ে ঢাক ;
ফরাস পাতি' করিব ধূলা বন্ধ !"
কহিল কেহ "রাজারে ঘরে রাখ
কোথাও যেন না থাকে কোন রন্ধ্র !
ধূলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধূলা ত লাগে না !"
কহিল রাজা "সে কথা বড় খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ —
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ !"
কহিল সবে "চামারে তবে ডাকি
চর্ম্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী !

ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
　　মহীপতির রহিবে মহাকীর্ত্তি !
কহিল সবে "হবে সে অবহেলে,
　　যোগ্যতম চামার যদি মেলে !"
রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
　　ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম্ম।
যোগ্যতম চামার নাহি কোথা,
　　না মিলে তত উচিতমত চর্ম্ম !
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
　　কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,—
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
　　সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ !
নিজের দুটি চরণ ঢাক, তবে
　　ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে !"
কহিল রাজা "এত কি হবে সিধে,
　　ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ !"
মন্ত্রী কহে "বেটারে শূল বিঁধে
　　কারার মাঝে করিয়া রাখ রুদ্ধ !"
রাজার পদ চর্ম্ম-আবরণে
　　ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে ;
মন্ত্রী কহে "আমারো ছিল মনে,
　　কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জান্‌তে !"
সেদিন হতে চলিল জুতো-পরা,
　　বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

শিশির ও কুয়াসা।

সুশীল। বাবা, সকালে ঘাসের উপর যে সকল জলবিন্দু দেখিয়াছিলাম, ওগুলি কোথা হইতে আসিল? এখনই বা সেগুলি নাই কেন?

বাবা। তাপের এই একটা গুণ আছে যে, কঠিন পদার্থকে তরল করিতে পারে, এবং তরল পদার্থকে বাষ্প করিতে পারে। লোহা যে এমন কঠিন পদার্থ, উহাও যথেষ্ট পরিমাণে তাপ দিলে তরল হইয়া যায়, এবং আরও অধিক তাপ দিলে, একেবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, অর্থাৎ বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। একটা কড়াতে জল পূরিয়া জ্বাল দিলে দেখিতে পাইবে, ধুঁয়া উঠিতেছে, অর্থাৎ জল বাষ্প হইতেছে।

দিনের বেলা সূর্য্যের উত্তাপে নদ নদী, খাল বিল, পুকুরের জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প হয় ও বায়ুতে মিশিয়া যায়। পৃথিবীও অনেক পরিমাণে সূর্য্যের তাপ গ্রহণ করে। রাত্রিতে পৃথিবী হইতে তাপ নিঃসৃত হইয়া যায়, সুতরাং পৃথিবী ও তন্নিকটস্থ বায়ু শীতল হয়; এই জন্য দিনের বেলা যতটা বাষ্প ধারণ করিতে পারে, তখন আর ততটা পারে না: সুতরাং অতিরিক্ত বাষ্প ভূতলে পড়িয়া বৃক্ষপত্র প্রভৃতি শীতল পদার্থের সহিত সংস্পর্শে পুনরায় জল হইয়া যায়। এই জলই তুমি সকালে ঘাসের উপর দেখিয়াছিলে। ইহাকে শিশির বলে। প্রাতঃকালে শিশির বিন্দু সকল সূর্য্যকিরণে কেমন ঝক্ ঝক্ করে! ঠিক যেন মুক্তা-ফলক! শিশির-পাতে শস্যেরও অনেক উপকার হয়। প্রকৃতিতে যাহা কিছু ক্রিয়া দেখিতেছ, সবই জীবের কল্যাণের জন্য।

সুশীল। আচ্ছা, বাবা, সকাল বেলা বাগানে যাইতে যাইতে নদীর উপরে, ধুঁয়া ধুঁয়া ও কি দেখিলাম?

বাবা। ও কুয়াসা, সুশীল। প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে যে, তুমি

হইতে যত শীঘ্র তাপ নিঃসৃত হয়, জল হইতে তত শীঘ্র হয় না। সুতরাং সন্ধ্যার পর তীর নদীর চেয়ে শীঘ্র শীতল হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তীরের বায়ুও শীতল হয়। প্রকৃতির আর একটা নিয়ম আছে যে, কোনস্থানের বায়ু উষ্ণ হইয়া উঠিয়া গেলে, চতুর্দ্দিকের ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া সেইস্থান পূরণ করে। এই কারণে তীরের শীতল বায়ু নদীর উপরিভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তথাকার বাষ্প মিশ্রিত বায়ুর সঙ্গে মিলিত হওয়াতে, বাষ্প শীতল হইয়া ধূঁয়ার আকার ধারণ করে। ইহাকেই আমরা কুয়াসা বলি।

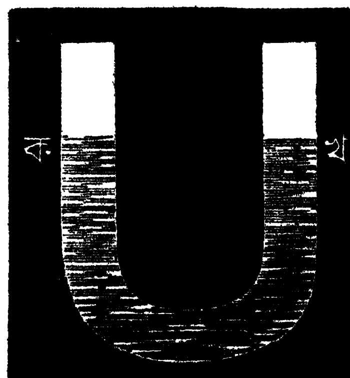
জলের কল।

বাবা। আমরা যখন কলিকাতায় থাকি তখন সকলেই কলের জল খাই। কেমন পরিষ্কার জল! ময়লার লেশ মাত্র নাই, একেবারে ছাঁকা হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে কলিকাতায় জলের কল ছিল না। তখন সহরের মৃত্যুসংখ্যা অনেক বেশী ছিল, জলের কল হওয়াতে আর তত লোক মরে না।

কলিকাতাতে যেমন জলের কল সহরের সব জায়গায় জল লইয়া যাইতেছে, স্বভাবেও সেইরূপ একটি জলের কল আছে। এই কলটা আছে বলিয়াই তুমি আমি সকলে জল খাইয়া বাঁচিয়া আছি। অবশ্য এ কলটা অতি বড়; যে কলটা জগতের সমস্ত জীব জন্তুকে জল যোগাইতেছে, সেটা যে যেমন তেমন কল নহে, তাহা তোমরা সকলেই অনুমান করিতে পার। কলিকাতার যে কোন জলের কলে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবে, লোহার একটা মোটা নল একবার উঠিতেছে আবার নামিতেছে। নীচের চৌবাচ্চা হইতে জল টানিয়া তোলাই উহার কার্য্য। আমাদের

স্বাভাবিক জলের কলেও ঐরূপ একটা উঠা নামার ব্যাপার আছে, কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে; জলের কলে জল টানিয়া উপরে তোলা হয়, স্বভাবের কলে জলকে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া দেয়।

সুশীল। আচ্ছা, বাবা, জল ঠেলিয়া উপরে তোলা হয় কেন?

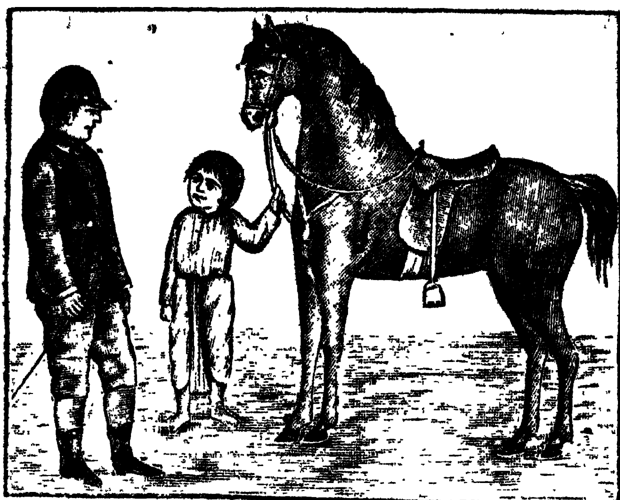


বেশ প্রশ্ন! জলের উঠা নামার সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক নিয়ম আছে। ঐ যে ছবিটি দেখিতেছ, ওটা একটা নলের ছবি। ঐ আকারের একটা নল লইয়া উহার এক মুখে জল ঢালিয়া দাও। দেখিবে "ক"য়ের দিকে জল যতটা উচু "খ"য়ের দিকেও ঠিক ততটা উচু। অর্থাৎ "ক"য়ের ভিতরের জল যতটা নিম্নদিকে চাপ দিতেছে "খ"য়ের ভিতরের জল ততটা উঠিতেছে। কলিকাতায় অনেক বড়লোকের বাড়ীতে দেখিতে পাইবে, দোতালার উপরে, তেতালার উপরে পর্য্যন্ত জলের নল গিয়াছে। কলের ভিতরে তত উচুতে জল না তুলিলে দোতালা তেতালায় জল যাইবে কেন? আর বাড়ীতে যে জলের নল আছে তাহার মুখ মাটি হইতে অনেক উচু, এবং জলও খুব জোরে পড়ে। জল টানিয়া উচুতে না তুলিলে নলের মুখ পর্য্যন্ত জল উঠিত না ও অত জোরেও জল পড়িত না। সেই জন্য কলের ভিতরে জল টানিয়া উচুতে তোলা হয়।

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাপ দিলে তরল বস্তু বাষ্প হইয়া যায়। যখন এত তাপ দেওয়া যায় যে বাষ্প বায়ু হইতেও হালকা হইয়া পড়ে, তখন বায়ু উহাকে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া দেয়।

সূর্য্যের উত্তাপে সর্ব্বদাই জল বাষ্প হইয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছে।

উপরে উঠিয়া আবার শীতল বায়ুর সংস্পর্শে কিঞ্চিৎ ঘন হইয়া মেঘের আকার ধারণ করিতেছে। অধিকতর শীতল বায়ুর স্পর্শে যখন এই পুঞ্জীভূত বাষ্পরাশি জল বিন্দুতে পরিণত হইতেছে, তখন বায়ু অপেক্ষা ভারি হইয়া বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। তুমি অনেকবার দেখিয়াছ যে কতকগুলি মেঘ একদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সকল মেঘ ছুটিতে ছুটিতে অনেক সময় কোন পাহাড়ের উপর আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথাকার শীতল বায়ুর স্পর্শে ঘন হইয়া বৃষ্টিরূপে পাহাড়ের উপরে পড়ে, তারপর নদীতে পড়িয়া নদীকে পোষণ করে; নদী এইরূপে পুষ্ট হইয়া যে দেশ দিয়া প্রবাহিত হয় সেই দেশের ভূমিকে সিক্ত ও উর্ব্বর করে এবং অনেক জল পরিশেষে সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। মৃত্তিকা অনেক বৃষ্টির জল শোষণ করিয়া লয়, এবং সেই জল ভূগর্ভে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই জন্যই মাটি খুঁড়িলেই জল বাহির হয়। এই ব্যবস্থা না থাকিলে পুকুর পাতকূয়া প্রভৃতি কিছুই সম্ভব হইত না; সুতরাং যে সকল স্থান নদী হইতে অতিদূরে সেখানকার লোক জলাভাবে মারা যাইত। কি আশ্চর্য্য জলের কল!



নির্লোভ বালক।

একবার কোন ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়িয়া সহরে যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাইয়া তিনি কোন দোকানে গিয়াছেন, এমন সময়ে ঘোড়াটা ছুটিতে আরম্ভ করিল। ভদ্র লোকটি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না, দেখিতে দেখিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি ছুটিতে লাগিলেন। কিছু দূর আসিয়া দেখিলেন, একটি বার কি তের বৎসরের কৃষক বালক তাঁহার ঘোড়ার মুখরজ্জু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! তিনি বালকের নিকটে আসিয়া তাহার সাহস ও কৌশলের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও?

বালক। আমি কিছুই চাই না, মহাশয়।

ভদ্রলোক। বটে! বেশ! বেশ! অতি অল্প লোকেই এমন কথা বলিতে পারে! তুমি মাঠে কি করিতেছিলে?

বা। আমি ক্ষেত নিড়াইতে ছিলাম, আর মেষ চরাইতেছিলাম।

ভ। এ কাজটা কি তোমার ভাল লাগে?

বা। হাঁ, খুব ভাল লাগে; এখন ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, আকাশ কেমন পরিষ্কার!

ভ। তুমি কি খেলিতে চাও না?

বা। এ কাজটা তত কষ্টকর নহে, প্রায় খেলারই মত। তা ছাড়া, বাবা বুড়ো হয়েছেন, একা সব পারেন না, তাঁহার কিঞ্চিৎ সাহায্য করাও হইতেছে!

ভ। কে তোমাকে একাজ করিতে বলিয়াছে?

বা। বাবা বলিয়াছেন।

ভ। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

বা। খুব নিকটে, ঐ গাছগুলার মধ্যে।

ভ। তোমার বাবার নাম কি?

বা। আমার বাবার নাম, হরিপদ দাস।

ভ। তোমার নাম কি?

বা। রামধন।

ভ। তোমার বয়স কত হইবে?

বা। প্রায় তের বৎসর।

ভ। কতক্ষণ তুমি মাঠে আসিয়াছ?

বা। সকাল ৬টা থেকে।

ভ। তোমার কি ক্ষুধা হয় নাই?

বা। হাঁ, হইয়াছে বই কি, এই একটু পরে বাড়ী যাইয়াই খাইব।

ভ। এখন যদি তোমায় কেহ চার আনার পয়সা দেয়, তাহা হইলে তুমি কি কর?

বা। জানিনা কি করি; অত পয়সা আমি কখনও দেখি নাই।

ভ। তোমার খেলনা আছে?

বা। খেলনা! খেলনা কাহাকে বলে?

ভ। যেমন ব্যাট্, বল, লাটিম, পুতুল ইত্যাদি।

বা। আমার ছোট ভাইটি মাটি দিয়া অনেক খেলনা তৈয়ার করে, আমরা তাই নিয়াই খেলি।

ভ। অন্য খেলনা চাও না কি?

বা। ঐ গুলি নিয়া খেলিবারই সময় পাই না আর অন্য খেলনা নিয়া কি করিব? আমাকে গোরু ঘোড়া দেখিতে হয়, বাজারে যাইতে হয়। এ সবই আমার কাছে খেলারই মত!

ভ। তুমি একখানা ছুরী নেবে?

বা। না, এই দেখুন আমার একখানা আছে, আমার ছোট মামা আমাকে দিয়াছেন।

ভ। তোমার জুতা যোড়াটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে দেখিতেছি। নূতন এক যোড়া নেবে কি?

বা। না, বাড়ীতে ভাল এক যোড়া আছে; কোন খানে যাইতে হইলে সেই যোড়া পরি।

ভদ্রলোকটি বালকের লোভশূন্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বারংবার তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন।

জোয়ার ভাঁটা।

সুশীল। বাবা, আজ সকালে দেখিলাম, নদী পরিপূর্ণ, কোন কোন স্থানে জল তীরে উঠিয়া পড়িয়াছে। আজ এত জল বাড়িয়াছে কেন, বাবা ?

বাবা। আজ যে পূর্ণিমা, পূর্ণ জোয়ার হইয়াছে, তাই অত জল।

সুশীল। জোয়ার কি ?

বাবা। সমুদ্রের জল প্রতিদিন দুই বার বাড়ে ও দুই বার কমে ; এই বাড়ার নাম জোয়ার, আর এই কমার নাম ভাঁটা।

সুশীল। সমুদ্রে জল বাড়িলে নদীতেও বাড়ে কেন ?

বাবা। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে ; সুতরাং সমুদ্রে জল বাড়িলে, সেই জল বেগে নদীতে প্রবেশ করে ; অতএব নদীর জলও বাড়িয়া যায়।

সুশীল। সমুদ্রে জল বাড়ে কেন ?

বাবা। যে দিন পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়, সেই দিনই জল অধিক বাড়ে, নয় কি ?

সুশীল। হাঁ, বাবা।

বাবা। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, জলের এই হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে চন্দ্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

সুশীল। হাঁ, বাবা। কিন্তু সে সম্বন্ধটা কি ?

বাবা। ঐ টানাটানির সম্বন্ধ। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগতে প্রত্যেক বস্তু অপর সব বস্তুকে আকর্ষণ করে, এবং যে বস্তু যত বড় ও যত নিকটে, তাহার আকর্ষণ তত বেশী।

সুশীল। আপনি ত বলিয়াছেন, সূর্য্য পৃথিবী হইতে চৌদ্দলক্ষ গুণ

বড়। সূর্য্য ত প্রতিদিনই উঠে, তবে সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জল বাড়ে না কেন?

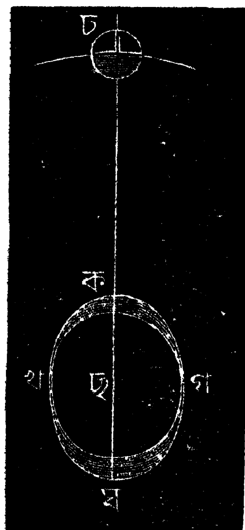
বাবা। সূর্য্য বড় বটে, কিন্তু দূরে, অতি দূরে বলিয়াই উহার আকর্ষণ তত প্রবল নহে; দূরত্ব অনুসারেও আকর্ষণের তারতম্য হয় কি না।

সুশীল। তবে কি সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জল একেবারেই বাড়ে না?

বাবা। হাঁ, বাড়ে বই কি; কিন্তু এত অল্পই বাড়ে যে তাহা বুঝা যায় না। আর চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা অনেক নিকটে বলিয়াই, উহার আকর্ষণে জল অধিক ফাঁপিয়া উঠে, এবং আমরা উহা দেখিতে পাই।

সুশীল। দিনে দুইবার জোয়ার হয় কেন?

বাবা। মনে কর চ চন্দ্র এবং কখঘগ পৃথিবী, খ সুমেরু অর্থাৎ



উত্তর প্রান্ত, গ কুমেরু অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্ত; ছ পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ

মধ্যস্থল। সুবিধার জন্য মনে কর, পৃথিবীর চারিদিকেই জল অর্থাৎ সমুদ্র।

এখন দেখ পৃথিবীর ক চিহ্নিত স্থান চন্দ্রের ঠিক নীচে, অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নিকটে, অতএব এই স্থানেই চন্দ্রের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই জন্য ক স্থানের জল সব চেয়ে বেশী ফাঁপিয়া উঠিয়াছে. অর্থাৎ ওখানে পূর্ণ জোয়ার হইয়াছে, আর খ ও গ চিহ্নিত স্থান দূরে বলিয়া ঐ দুই স্থানের জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ ঐ দুই স্থানে ভাঁটা হইয়াছে।

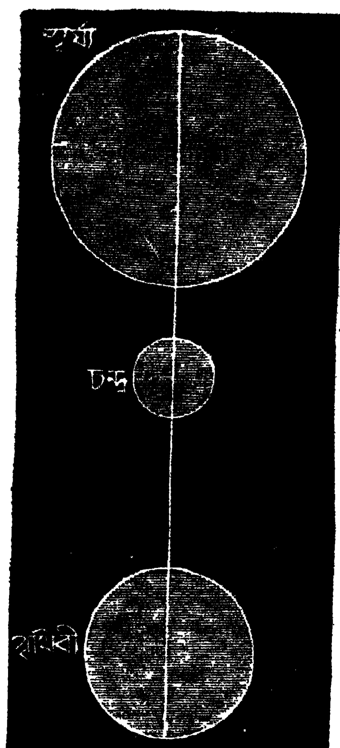
সুশীল। আচ্ছা দিনে দুইবার জোয়ার কেন হয়, বাবা?

বাবা। বেশ প্রশ্ন! ঘ চিহ্নিত স্থান চন্দ্র হইতে সব চেয়ে বেশী দূরে, সেই জন্য চন্দ্রের আকর্ষণও ওখানে সব চেয়ে কম। অতএব ঘ চিহ্নিত স্থানের স্থলভাগ চন্দ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে চন্দ্রের দিকে উঠিয়া পড়ে এবং তৎসংলগ্ন জল ভাগ ঝুলিয়া পড়ে। সুতরাং ক চিহ্নিত স্থানে যখন জোয়ার, ঘ চিহ্নিত স্থানেও তখন জোয়ার। পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে যখন ঘ চিহ্নিত স্থান চন্দ্রের নিকটে আসে, তখন আবার ঘ চিহ্নিত স্থানে ও ক চিহ্নিত স্থানে এক কালে জোয়ার হয়। সুতরাং দিনে দুইবার জোয়ার হইয়া থাকে।

সুশীল। অমাবস্যাতে অধিক জোয়ার হয় কেন?

বাবা। মনে কর একটি ছোট ছেলে কষ্টে স্রষ্টে একটা ভারি জিনিষ টানিয়া তুলিতেছে, এমন সময়ে একজন অতিকায় পুরুষ আসিয়া সেই দড়িটা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল; তাহা হইলে দুই জনের মিলিত শক্তিতে জিনিষটা কেবল ছেলেটি ধরিয়া টানিলে যতদূর উঠিত, তার চেয়ে অনেক বেশী উঠিবে না কি?

সুশীল। নিশ্চয়ই।

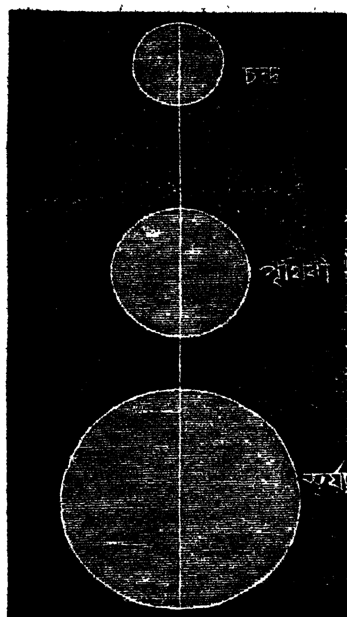


অমাবস্যা।

বাবা। সূর্য্যও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ জল রাশিকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও করে। অমাবস্যার দিন সূর্য্য ও চন্দ্র সমসূত্রে থাকে। সেই জন্য জল অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক ফাঁপিয়া উঠে অর্থাৎ অধিক জোয়ার হয়। চলিত ভাষায় এই জোয়ারকে কোটাল বলে ও অষ্টমী নবমীর মৃদু জোয়ারকে মরা কোটাল বলে।

সুশীল। পূর্ণিমার দিন অধিক জোয়ার হয় কেন ?

বাবা। পূর্ণিমার দিন সূর্য্য চন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। চন্দ্র ক চিহ্নিত স্থানের ঠিক উপরে আছে, সুতরাং উহার আকর্ষণ অন্যান্য দিন



পূর্ণিমা।

অপেক্ষা অধিক। সূর্য্য বিপরীত দিকে ঘ চিহ্নিত স্থানের ঠিক উপরে আছে, সুতরাং ওখানে সূর্য্যের আকর্ষণ অধিক, এবং ক চিহ্নিত স্থানে সূর্য্যের আকর্ষণ স্থল ভাগকে টানিয়া তুলিতেছে, অতএব ক চিহ্নিত স্থানের জল নত হইয়া পড়িবে। তাহা হইলেই দেখ ক চিহ্নিত স্থানে দুই শক্তি কার্য্য করিতেছে, চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি ও জল নত হইবার শক্তি। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে ক চিহ্নিত স্থানে জল অধিক ফাঁপিয়া উঠিবে অর্থাৎ পূর্ণ জোয়ার বা কোটাল হইবে। বুঝিলে, সুশীল!

অতি বুদ্ধি।

কোন গ্রামে গোপাল নামে একটি লোক ছিল। গ্রামে কেবল চাষাদের বাস, কেহই লেখাপড়া জানিত না, গোপালই কেবল একটু লেখা পড়া জানিত। সেই জন্য গ্রামের লোকেরা তাহাকে বিশেষ সম্মান করিত ও বলিত, গোপাল বড় বুদ্ধিমান্। লোকের প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া তাহার অহঙ্কার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল; সর্ব্বদাই সে মাথা উঁচু করিয়া থাকিত, কাহারও সঙ্গে অধিক কথা বলিত না, এবং পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় প্রায়ই নিজের ঘরে মশারি খাটাইয়া, নাকে কানে ছিপি দিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার প্রশংসা শুনিয়া আর কতকগুলি লোক তাহার সঙ্গে আসিয়া জুটিল, এবং তাহার শিষ্য হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। তাহাদের অহঙ্কার আবার গোপালের চেয়ে বেশী; কারণ গোপাল তবু কিছু লেখা পড়া জানিত, উহারা একেবারে নিরক্ষর।

এক দিন শিষ্যগণ একত্র নদীর ধারে বেড়াইতে গেল। সন্ধ্যা তখন সমাগত, সূর্য্য পশ্চিমাকাশে নামিয়া গিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে অন্ধকার আসিয়া দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছে। হঠাৎ তাহারা দেখিতে পাইল একটা জন্তু (শূকর) বন হইতে বাহির হইয়া মাঠের ভিতর দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! কিছুক্ষণ পরে একজন ভয়ে ভয়ে বলিল, "ওটা কিরে, ভাই?" অপর একজন বলিল, "ওটা ভাই গরীবের বাড়ীর হাতী, খাইতে না পাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে!" আর একজন বলিল, "না ভাই, ওটা বড় লোকের বাড়ীর ছুঁচো, কেবল খাইয়া খাইয়া এত বড় হইয়াছে!" এই লইয়া দুই দল হইল ও মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল, মারা মারি হয় আর কি! তখন

উহাদের মধ্যে একজন বলিল, "ওরে ভাই, ঝগড়া মারামারির দরকার কি, চল না একবার গুরুজির কাছে যাই, তিনিই আমাদের ঝগড়া মিটাইয়া দিবেন।"

সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গুরুর কাছে চলিল। তাহাদের গলার আওয়াজ শুনিয়া গুরুজি মশারির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "আজ হঠাৎ এখানে আসিবার কারণ কি? সব ভাল ত?" তাহারা বলিল, আপনার আশীর্ব্বাদে সব ভালই। আমাদের মধ্যে এক তর্ক হইয়াছে, তাহাই মিটাইবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। "কি তর্ক?" শিষ্যগণ তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। গুরু শুনিয়া অনেক-ক্ষণ বিষণ্ণভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন, তারপর রাগিয়া বলিলেন, "আমি মরিলে তোদের কি দুর্দ্দশাই হইবে! এত করিয়া তোদের শিখাইলাম, তবুও তোদের কিছু মাত্র জ্ঞান হইল না। এই সামান্য বিষয়টা লইয়া এত ঝগড়া! তোদের এই টুকু বুদ্ধি হইল না যে পদার্থটা কি স্থির করিস্!" শিষ্যেরা বলিল, "মহাশয়, আমাদের গাল দিয়া আর কি হইবে? আমাদের যদি বুদ্ধিই থাকিবে, তবে আপনার কাছে আসিলাম কেন? এখন দয়া করিয়া আমাদের বিবাদটা মিটাইয়া দিন।" গোপাল তখন বলিল, "দেখ. এক কাজ কর, সেটাকে ধরিয়া নদীতে ফেলিয়া দাও। যদি ভাসে, তবে জানিবে সেটা ঢেঁকি, আর যদি ডোবে, তবে জানিবে যে সেটা কুমীর!"

শিষ্যেরা তখন গুরুর কাছে বিদায় লইয়া জন্তুটাকে খুঁজিতে গেল। কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বনের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মনে করিল জন্তুটা নিশ্চয়ই ফিরিবে, এবং ফিরিলেই সেটাকে নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া দেখিবে, সেটা ঢেঁকি কি কুমীর। কতক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড হাতী বন হইতে বাহির হইয়া আসিল। হাতীটাকে দেখিয়াই

তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "এই রে ভাই, জন্তুটা এসেছে, এটা এর মধ্যে এত বড় হল কি করে ?"

এই বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিতে গেল, আর হাতী মহাশয় একে একে সকলকে শুঁড়ে জড়াইয়া শ্রীচরণের তলে ফেলিয়া বুদ্ধি বাহির করিয়া দিলেন !!

মূর্খতার শাস্তি এই রূপই বটে !

মৌমাছি ।

মৌমাছি কেমন ব্যস্ত ! এক মুহূর্ত্তও বসিতেছে না, কেবল এ ফুল থেকে ও ফুল উড়িয়া যাইতেছে ! উহার একটা কাজ আছে কি না, বসিয়া থাকিবে কেন ? এ জগতে যাহার কাজ আছে, সে কখনও বসিয়া থাকে না। মৌমাছির কাজ মধু আহরণ ; এই কাজেই মৌমাছি সর্ব্বদা ব্যস্ত !

মৌমাছি এক জাতীয় কীট। উহার ডানা আছে, সুতরাং উড়িয়া বেড়াইতে পারে। উহার একটা লম্বা জিভ্ আছে, সেটাকে ফুলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া মধু টানিয়া লয়। উহার একটা হুলও আছে।

তোমরা অবশ্য মৌমাছির চাক দেখিয়াছ। কেমন সুন্দর ! কেমন কারুকার্য্য ! চাকে ছোট ছোট ঘর আছে, সে গুলি মোমে প্রস্তুত। উহাদের কতকগুলিতে ছানা, আর অপরগুলিতে মধু থাকে।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৌমাছিরা মধু আনিতে যায়, আবার সন্ধ্যাবেলা চাকে ফিরিয়া আসিয়া ঘুমায়।

মৌমাছিদের মধ্যে কার্য্যবিভাগ আছে, উহারা সকলে এক কাজ করে না। চাকে চারি প্রকার মাছি থাকে। কতকগুলি মধু আহরণ করে,

কতকগুলি গৃহনির্ম্মাণ করে, কতকগুলি ছানাগুলিকে দেখে শুনে, আর পুরুষ মাছি গুলো কিছুই করে না। উহারা এমনি কাপুরুষ যে বসিয়া বসিয়া মেয়েদের রোজগার খায়! মেয়েরা খাটিয়া খাটিয়া মরে, আর উহারা বসিয়া আরাম করে!

সব চাকেই একটা রাণী মাছি থাকে। তাহার শরীর অন্যান্য মাছির চেয়ে লম্বা। সে কেবল ডিম পাড়ে। মৌমাছিরা রাণীর বড়ই সম্মান করে। সে যখন বাহিরে যায়, তাহার সঙ্গে অনেক মাছি পাহারা থাকে। তাহারা প্রাণ দিয়াও তাহাদের রাণীকে রক্ষা করে।

তোমরা শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, মৌমাছিরা কথা কহিতে পারে, উহাদের একটা ভাষা আছে। আমরা মুখ দিয়া কথা কহি, উহারা উহাদের বুকে ও শরীরের পশ্চাৎ দিকে বাতাস প্রবেশের জন্য যে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া কথা কহে। চাকের দরজায় সর্ব্বদাই কয়েকটা মাছি পাহারা দেয়। বড় লোকের বাড়ীর দরজায় যেমন দরোয়ান্ থাকে, তাহারা বাহিরের খবর ভিতরে লইয়া যায়, উহারাও তেমনি বাহিরের খবর ভিতরে পাঠায়। যখন কোন সংবাদ দিবার প্রয়োজন হয়, তখন ঐ সকল ছিদ্রের সাহায্যে উহারা এক রকম শব্দ করে, এবং ভিতরের মাছি গুলি বুঝিতে পারে, উহাদের অভিপ্রায় কি! ঠিক যেন দরজা হইতে দরোয়ান চীৎকার করিয়া বলে, "বাবুজি, একঠো চিঠি আয়া।"

যখনই কোন মাছি কোন সংবাদ লইয়া আইসে, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, আর সে দুইবার কি তিনবার একরকম শব্দ করে, আর তার পা দিয়া কোন একটা মাছিকে স্পর্শ করে। সে খবরটা ঐ রকমে আর একটা মাছিকে দেয়, সে আবার আর একটাকে দেয়, এইরূপে সকলেই খবরটা জানিয়া ফেলে। যখন কোন সুসংবাদ আসে, তখন চাকে কোন গোলমাল হয় না, সকলেই স্থির থাকে; কিন্তু কোন দুঃসংবাদ আসিলে,

চাকে ভারি একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়, সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে, এখানে একদল, ওখানে একদল মিলিয়া যেন পরামর্শ করিতে থাকে !

বসন্তকালে ছানাগুলির খাবার প্রস্তুত করিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। যে ব্যক্তি মাছি পোষে, সে তখন চাকের একটু দূরে কতকটা জল রাখিয়া দেয়। তারপর একখানা লাঠিতে মধু মাখাইয়া চাকের মুখে ধরে, আর কতকগুলি মাছি লাঠিটার উপরে আসিয়া বসে। তখন সে মাছিগুলিকে জলের কাছে লইয়া যায়, এবং উহারা অবিলম্বে চাকে ফিরিয়া গিয়া সকলকে খবর দেয়। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া জলের কাছে উপস্থিত হয়।

বিধাতা সব জীবেরই অভাব মোচনের জন্য এক একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দেখা আর না দেখা।।

শিবদাস বাবু একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। হুগলী জেলার অন্তর্গত সন্তোষপুর গ্রামে ইঁহার বাড়ী। ইঁহার দুইটি পুত্র, একের নাম হরি, অপরের নাম শশী। দুইজনে অধিক ছোট বড় নয়, সুতরাং দুই জনই এক শ্রেণীতে পড়ে। হরির বয়স ১৫ বৎসর, শশীর বয়স ১৪ বৎসর। শশী কিন্তু পড়া শুনায় ভাল; তার একটা বিশেষ গুণ আছে, সেটা মনোনিবেশ। সে যাহা করে, একমনে করে। এই রকম ছেলেই পরে বড় লোক হয়। হরি একটু অন্যমনস্ক, কিছুতেই তাহার মন ভাল করিয়া বসে না। যাহাদের মনের অবস্থা এইরূপ, তাহাদের লেখা পড়া হওয়া সুকঠিন।

এক দিন দুই ভাই সকালে বেড়াইয়া আসিলে পর শিবদাস বাবু হরিকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা হরি, তুমি আজ বেড়াইতে যাইয়া কি কি দেখিয়া আসিলে?" হরি বলিল, "কি দেখিব, বাবা? রোজ যাহা দেখি, আজও তাহাই; বিশেষ কিছু দেখিলাম না। শিবদাস বাবু হরির এই উত্তর শুনিয়া মনে মনে একটু দুঃখিত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। তার পর শশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা শশী, তুমি কি দেখিলে?" শশী বলিল, "বাবা, কত ভাল ভাল জিনিষ যে দেখিয়াছি, তাহা আর কি বলিব! কিছু কিছু আপনাকে বলিতেছি, শুনুন্।

"ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখি, দরজায় একটা কুকুর শুইয়া আছে। আমার পায়ের শব্দ পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আমার কাছে আসিয়া লেজ নাড়িয়া ও এক রকম শব্দ করিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, কুকুরটা বাড়ীর লোক চেনে ও ভাল বাসে। বাবা, ইতর জন্তুরও জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভালবাসা আছে, নয় কি?

বাবা। হাঁ, আছে বই কি। তার পর?

শশী। তার পর বাড়ীর বাহির হইয়াই দেখি, আমাদের বাগানে নানা রকম ফুল ফুটিয়া আছে,—গোলাপ ফুল, বেল ফুল যুঁই ফুল, আর কত ফুল! ফুলগুলি যেন হাসিতেছে! গন্ধে চারি দিক অমোদিত! সেই সকালেই দেখি, মৌমাছি গুলি আসিয়া জুটিয়াছে, আর মধুপানে আনন্দিত হইয়া গুন্ গুন্ রবে ফুলে ফুলে ছুটাছুটি করিতেছে! ওরা বোধ হয় ফুল খুঁজিয়া বেড়ায়, তাই জানে যে আমাদের বাগানে রোজ ফুল ফুটে!

বাবা। হাঁ শশী, ওরা জানে; ওদের এই কাজ। তার পর?

শশী। একটুকু যাইয়াই দেখি, একটা কাক গলার ভিতর হইতে খাবার বাহির করিয়া তার ছানাটাকে খাওয়াইতেছে। দেখিয়া মনে হইল, আমার মা যেমন আমাকে ভালবাসেন ও নিজে না খাইয়া খাওয়ান, কাকটাও দেখিতেছি সেই রকম। ভালবাসাটা সবজন্তুরই আছে;

নতুবা সামান্য একটা কাক নিজে না খাইয়া ছানাটাকে খাওয়াইবে কেন ?

বাবা। তার পর ?

শশী। তার পর বাগানের সরু রাস্তা দিয়া বড় রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখি একটি রাখাল ছেলে এক পাল গরু নিয়া মাঠে যাই-তেছে, ও যাইতে যাইতে একটা অতি মিষ্ট গান গাইতেছে। রাখাল মনের আনন্দে গাইয়া যাইতেছে। ছেলেটির সুর এমনি মিষ্টি যে শুনিতে শুনিতে আমার মন যেন কোথায় চলিয়া গেল ! এই উদাস ভাব লইয়া চলিতে চলিতে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নদী চলিয়াছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কল কল রবে বহিয়া বহিয়া কোথায়; কোন দূরদেশে ছুটিয়াছে ! কত নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে, কত নৌকা স্রোতের অভিমুখে ছুটিতেছে, মাঝি চুপ করিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। কোথাও বা বক ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া আহার খুঁজি-তেছে, কোথাও বা একটা মাছরাঙা ঝুপ্ ঝাপ করিয়া জলে পড়িয়া ছোট একটি মাছ লইয়া আকাশে উঠিতেছে, কোথাও বা একটা শুশুক ভুস্ করিয়া উঠিয়া পাক দিয়া অবার তখনই জলে ডুবিয়া যাইতেছে। নদীর তীর দিয়া আর কিছু দূর যাইয়া দূরে কয়েকটি দেব-মন্দির দেখিতে পাইলাম। সেখানে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছিল, আর সেই মধুর ধ্বনি বায়ুর হিল্লোলে দিগ্ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

বাবা। তার পর ?

শশী। তার পর কিছু দূর যাইয়া দেখি, উত্তর দিক হইতে একখানা ষ্টীমার আসিতেছে, জল একেবারে তোল পাড় ! তার বেগই বা কত, আর শক্তিই বা কত ! তখন আমার ইংরাজী বইতে যে জেমস্ ওয়াটের কথা পড়িয়া ছিলাম তাহাই মনে পড়িল। মনে হইল, একজন লোক

চিন্তাদ্বারা জগতের কতই উপকার করিতে পারে! আর আমাদের নৌকা ও সাহেবদের জাহাজের যে কত তফাৎ তাহাও বুঝিতে পারিলাম।

বাবা। তার পর?

শশী। তার পর আর একটু যাইয়া দেখি, নদী একটু তীরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, আর কতকগুলি ধান, চাল, লবণ, গুড় বোঝাই নৌকা লাগিয়া আছে, কাছেই কতকগুলি কুলি সে সব জিনিষ ওজন করাইয়া ঘরে তুলিতেছে। ও! সেখানে কি ব্যস্ততা ও গোলমাল! ওটা বোধ হয় একটা বন্দর। মনে মনে ভাবিলাম, এই রূপে এক স্থানের জিনিষ অন্য স্থানে যাইয়া সেখানকার লোকের অভাব দূর করিতেছে। বাণিজ্যের দ্বারা আমাদের কতই হিত সাধিত হইতেছে!

আমি যখন বন্দরে তখন খুব রৌদ্র উঠিয়াছে, সুতরাং আর অধিক দূর না যাইয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

ল্যাজে কামড়।

তিনটা বুনো বাঁদর ছিল
একটা গাঁয়ের মাঝে,
দিন রাত্তির হুপ্ হাপ্
ঘুরে বেড়ায় গাছে।
মেশামিশি যেমনি তা'দের
তেমনি তা'দের আড়ি,
একটা কিছু খেতে গেলে
আর টা নিত কাড়ি।

একদিন সে হয়েছে কি
যুক্তি আঁটি সার,
তিন বাঁদরে কাঁকড়া খেতে
গেল নদীর ধার
যেমনি তা'দের দেখ্‌তে পাওয়া
অমনি তাড়াতাড়ি,
কাঁকড়াগুলো গর্ত্তের মাঝে
সটান দিল পাড়ি।
তিন বাঁদরে উঁকি ঝুঁকি
কাঁকড়া নাহি পায়
ভেবে ভেবে পালের গোদার
বুদ্ধি উপজয়।
সবার ছোট বাঁদর যেটা,
ল্যাজটা তার ধরে,
গোদা মশায় চুপে চুপে
গর্ত্তে দিলেন পুরে।
যেমনি দেওয়া অমনি ধরা
বাপরে সে কি দাঁত!
ল্যাজ্‌ ধরে টানে হনু
হয়ে চিৎপাৎ।
টানে আর ভাবে ব'সে
এ কি হল দায়!
ধাড়ি দুটো দূরে রক্ষক
আড় চোখে চায়।

গোদা মশাই ব'সে আছেন
দুষ্টুমীতে ভরা।
ল্যাজ্ ধরে কে টান দেয় রে,
কোন্ লক্ষ্মীছাড়া ?
কাঁকড়া দেখে গোদা মশাই
দিলেন এক লাফ,
ঠিক্‌রে কাঁকড়া পড়লো জলে
ল্যাজ্ হ'ল সাফ্।
কাজ নিক আর কাঁকড়া খেয়ে
বাপরে বাপ !
ল্যাজ্ সাম্‌লে পালাই ছুটে
ওটা পড়ে থাক্।
পর দিনেতে এসে সবাই
দেখে নদীর ধার ;
বানর একটা প'ড়ে আছে
ল্যাজ্ নাইক তার।
তার পরেতে ঘটল যাহা
ব্যাপার সহজ নয়।
পরে মন্দ কর্‌তে গেলে
এমনি দশা হয়।
গুলি খেয়ে ম'ল একটা
সাহেবের হাতে,
নাচের বাঁদর হ'য়ে আরটা
ফেরে পথে পথে।

গ্রহণ।

বাবা। সুশীল, আজ পূর্ণিমার রাত্রি, একটার সময় চন্দ্র গ্রহণ হইবে তুমি দেখিবে কি ?

সুশীল। হাঁ, দেখিব বই কি, বাবা।

বাবা। ততক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিবে ত ?

সুশীল। পারিব, বাবা।

বাবা। না, তোমাকে জাগিয়া থাকিতে হইবে না, আমি ঠিক সময়ে তোমাকে তুলিব।

সুশীল। আচ্ছা, বাবা, দেখিবেন যেন ভুলিবেন না।

বাবা। ঐ ঘড়িতে একটা বাজিল। সুশীলকে তুলি। সুশীল, সুশীল, ওঠ, একটা বাজিয়াছে, এখনই গ্রহণ লাগিবে।

সুশীল। আপনি কি ঘুমান নাই, বাবা ?

বাবা। তখন হইতেই জাগিয়া আছি ও জগতের শোভা দেখিতেছি। ঐ দেখ গ্রহণ লাগিয়াছে। পূর্ণ গ্রাস হইবে। দেখ ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে।

সুশীল। চন্দ্র গ্রহণ কেমন করিয়া হয়, বাবা ?

বাবা। চল, ঘরের ভিতরে যাই। আলোটা জ্বাল ত।

সুশীল। এই আলো জ্বালিয়াছি বাবা ?

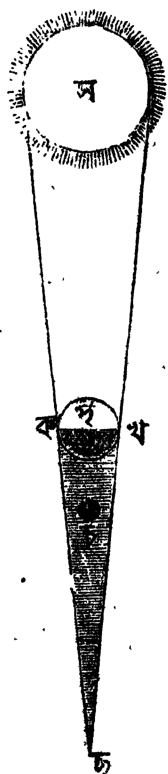
বাবা। আলোটা টেবিলের উপর রাখ। তোমার সেই বড় বলটা ও ছোট বলটা বাহির কর। ছোট বলটা আলোর একটু দূরে ধর, আর বড় বলটা মাঝে ধর। কি হইল ?

সুশীল। ছোট বল্‌টা আঁধারে পড়িয়া গিয়াছে।

বাবা। কেন পড়িল বলত।

সুশীল। বড় বলটা যে আলোকে বাধা দিতেছে।

বাবা। চন্দ্রের সম্বন্ধেও তাই; আমি তোমাকে পূর্ব্বেইবলিয়াছি, চন্দ্র একটা উপগ্রহ, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী আবার সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে আইসে, তখন সূর্য্যের আলোক বাধা পায়, আর চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ায় পড়িয়া যায়। ইহাকেই বলে চন্দ্রগ্রহণ।



সুশীল। কেন, চন্দ্রের কি নিজের আলো নাই?

বাবা। না, চন্দ্র সূর্য্যের আলোকেই আলোকিত।

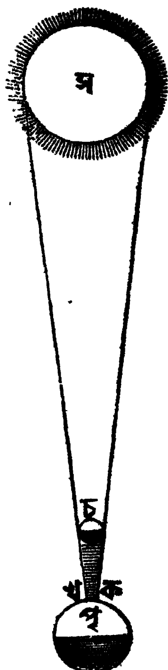
সুশীল। চন্দ্রগ্রহণ কেমন করিয়া হয়, তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু সূর্য্য গ্রহণ কেমন করিয়া হয়, বাবা?

বাবা। বেশ প্রশ্ন! আচ্ছা, এবারে ছোট বলটাকে মাঝখানে ধর, আর বড় বলটাকে এমন করিয়া ধর যে, যে দিকে কলিকাতা লেখা আছে, সেই দিক যেন ছোট বলটার দিকে থাকে। কি হইল?

সুশীল। কলিকাতা আঁধারে পড়িয়া গিয়াছে।

বাবা। এখন মনে কর, ছোট বল্‌টা যেন চন্দ্র, বড় বল্‌টা যেন

পৃথিবী, আলোটাযেন: সূর্য্য, আর কলিকাতায় যেন অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। কলিকাতার লোক সূর্য্য দেখিতে পাইবে কি ?



সুশীল। কখনই না, তাদের দৃষ্টি যে বাধা পাইতেছে।

বাবা। ঠিক তাই। চন্দ্র মধ্যস্থলে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে বাধা দেয়, সুতরাং আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই না। ইহাকেই বলে সূর্য্যগ্রহণ।

টিয়া পাখী।

কোন ব্যক্তির দুইটি টিয়া পাখী ছিল, তাহারা এক খাঁচাতেই বাস করিত, এবং পরস্পরকে বড়ই ভাল বাসিত। চার পাঁচ বৎসর এক সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার পর, হঠাৎ একটি পাখীর পায়ে ঘা হইল। ঘা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। অনেক সেবা শুশ্রূষাতেও কিছুই হইল না। পীড়িত পাখীটি ক্রমে দাঁড় ছাড়িয়া নীচে আসিয়া বসিল। প্রথম প্রথম সে একটু চলা ফেরা করিতে পারিত, ক্রমে সে শক্তিটুকুও গেল, তাহার আর নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা রহিল না। অপর পাখীটি তখন উহার সেবা করিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত দিন সে আর অন্য কিছুই করিত না। কখন কাছে বসিয়া, কখনও ঠোঁটে করিয়া খাদ্য লইয়া তাহার মুখে দিয়া, কখনও বা ডানা মেলিয়া তাহাকে ঢাকিয়া, সে সেই পীড়িত পাখীর যন্ত্রণা দূর করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সব যত্ন চেষ্টা বিফল হইল। পীড়িত পাখীর অবস্থা ক্রমে অতি দুঃখকর হইয়া উঠিল। ঘাড় নীচু করিয়া, চক্ষু মুদিয়া সে এক রকম অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কেবল এক একবার অস্পষ্ট স্বরে চি চি করিত; ইহা ভিন্ন তাহার জীবনের অন্য কোন লক্ষণই ছিল না। তাহার সঙ্গী পূর্ব্বের ন্যায় ঠোঁটে করিয়া খাদ্য আনিয়া দিত বটে, কিন্তু তাহা গিলিবার শক্তিও তাহার রহিল না। এই সময়ে সুস্থ পাখীটির অস্থিরতা ও সঙ্গীর যন্ত্রণা নিবারণে ব্যাকুলতা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইত, এবং কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। সঙ্গী আর খাইতে পারিতেছে না দেখিয়া, সেও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা তাহার পাশে বসিয়া থাকিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কেবল দুঃখ-

ব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করিত। আর কিছুতেই তাহার মন ছিল না। ক্রমে তাহার সঙ্গী চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন তাহারও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। আহার নিদ্রা ত সে পূর্ব্বেই ছাড়িয়াছিল, এখন কেবল সঙ্গীর মৃতদেহ ডানায় ঢাকিয়া দিন রাত চীৎকার করিতে লাগিল। সে চীৎকারে পাষাণও গলিয়া যায়। মৃতদেহ সরাইয়া লয় কাহার সাধ্য? অনেক চেষ্টায় মৃতদেহ বাহির করা গেল বটে, কিন্তু তাহাকে আর বাঁচাইতে পারা গেল না! সঙ্গীর মৃত্যুর দুই দিন পরে সেও প্রাণত্যাগ করিল!

ভাল ছেলে।

যশোহর জেলায় সুবর্ণপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। এই গ্রামে একটি উচ্চ শ্রেণীর স্কুল আছে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দর একখানি একতলা বাড়ী, সেই বাড়ীতেই স্কুল। স্কুলগৃহের পশ্চিমদিকে সুপ্রশস্ত রাজপথ, রাজপথের ধারে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ। স্কুলের পূর্ব্বদিকে একটা ফুলের বাগান, দক্ষিণে সুদূর প্রসারিত প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, উত্তরে খুব একটা বড় পুকুর, চারিদিকে শান বাঁধান ঘাট, তার পরেই গ্রাম। স্থানটি কেমন মনোরম! ছাত্রগণ স্বভাবতঃ এই স্থানটি ভালবাসে; সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে আসিয়া শিক্ষক-দিগের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করে। স্থানের মাহাত্ম্যে ও শিক্ষকদিগের কোমল বৎসল ব্যবহারে স্কুলটি তাহাদের অতি প্রিয় স্থান।

এখন স্কুলের নিকট আর বাড়ী ঘর নাই, কিন্তু পূর্ব্বে এই মাঠের

ভিতরে একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর ছিল। এই কুটীরে স্কুলের গরীব ভৃত্য সনাতন বাস করিত। নিকটে থাকিলে স্কুলের কাজের সুবিধা হইবে বলিয়াই সে এই স্থানে ঘর বাঁধিয়াছিল। তাহার স্ত্রীও তাহার সঙ্গে থাকিত। ভৃত্যটি বড়ই বিশ্বস্ত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে ভালবাসিতেন ও মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন। গুণগ্রাহিণী শ্রদ্ধা সমাজে কে বড় কে ছোট তাহার বিচার করে না, কিন্তু স্বতই গুণবানের অভিমুখেই ধাবিত হয়। সে অল্পই বেতন পাইত, কিন্তু সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ও নানা উপায়ে তাহাকে সাহায্য করিত; সুতরাং অক্লেশে তাহার দিন চলিয়া যাইত। ক্রমে তাহদের একটি পুত্র জন্মিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া তাহাদের কতই আনন্দ! স্বামী স্ত্রী উভয়েই পুত্রটিকে ঈশ্বরের কৃপার দান মনে করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে উহাকে গ্রহণ করিল এবং উভয়ে মিলিয়া আন্তরিক যত্নে উহার লালন পালন করিতে লাগিল।

এইরূপে দিন যায়। হঠাৎ এক দিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। দিবা অবসন্ন, সূর্য্য পশ্চিমাকাশের প্রান্তভাগে উপস্থিত, দুই একটি মন্দীভূত রশ্মি তখনও বটবৃক্ষের শীর্ষদেশে পড়িয়া আছে, আর নব পত্র সকল তাহাতে ঝিক্ মিক্ করিতেছে। পক্ষিকুল যেন কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পরের নিকট লইতেছে। এমন সময়ে সনাতন স্কুলের কার্য্য শেষ করিয়া গৃহে ফিরিল। সাধ্বী স্ত্রী তাহার ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত নিকটে আসিয়া বসিল ও ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। শিশুটি নিকটে আসিয়া তাহার অমিয়া মাখা আধ আধ স্বরে নানা কথা বলিয়া তাহার চিত্তে অপূর্ব্ব আনন্দ ঢালিয়া দিতে লাগিল। শিশুটির সরলতা, নির্ম্মলচিত্ততা ও সদানন্দ ভাব দর্শনে তাহাদের মনে বাস্তবিকই দেবভাবের স্ফূর্ত্তি হইত। আহারান্তে সনাতন ঈশ্বরের নাম লইয়া শয়ন করিল, স্ত্রীও

শিশুটিকে বক্ষে লইয়া আপনার শ্রান্ত দেহকে ক্লেশনাশিনী নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে অর্পণ করিল।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। জমিদার বাবুদের পেটা ঘড়ীতে ঢন্ ঢন্ করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। সনাতন তখন হরি হরি বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে গেল। স্ত্রীও উঠিয়া শিশুটির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। প্রায় এক ঘণ্টা গেল, তবুও স্বামী ফিরিলেন না দেখিয়া, নীরদা চিন্তিতমনে তাঁহাকে খুঁজিতে গেল। যাইয়া দেখে স্বামী এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছেন, উঠিয়া বাড়ী যান এমন শক্তি নাই। নীরদা তাহাকে ধরাধরি করিয়া অতি কষ্টে গৃহে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তাহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, যে স্বামী সাংঘাতিক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া গ্রামের লোকদিগকে সংবাদ দিল। স্কুলের শিক্ষকগণ, অনেক ছাত্র, ও গ্রামের ধনী মানী অনেক লোক আসিয়া এই গরীব কুটীরবাসী ভৃত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলেন! কিছুই আশ্চর্য্য নহে; সাধুতার এমনি গুণ যে তদ্দ্বারা সকলেই বশীভূত হয় ও পার্থিব মান মর্য্যাদা একেবারেই ভুলিয়া যায়। চিকিৎসা, সেবা ও শুশ্রূষা যথেষ্ট হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। দেখিতে দেখিতে সনাতনের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল। নিরাশ্রয়া নিঃসম্বলা স্ত্রী ভূতলে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ মিলিয়া সনাতনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তার পর কি উপায়ে তাহার বিধবা স্ত্রী ও পিতৃহীন শিশুর ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইবে, সেই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ দয়া করিয়া সনাতন যে বেতন পাইত তাহার অর্দ্ধেক দিতে লাগিলেন, আর স্কুলে চাঁদা তুলিয়া কিছু দেওয়া হইতে লাগিল। এইরূপে

যাহা কিছু আয় হইতে লাগিল, দরিদ্রা বিধবা তদ্দ্বারাই কষ্টে স্রষ্টে দিন চালাইতে লাগিল।

স্কুলে বিনয় নামে একটি বালক পড়িত। ছেলেটি যেমনি পড়া শুনায় ভাল তেমনি সুশীল। তাহার পিতা মাতা ধনশালী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল, এবং গরীব দুঃখীকে দুপয়সা দেওয়া, আপদে বিপদে তাহাদের যথা-সাধ্য উপকার করা, তাঁহাদের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। সুতরাং ছেলেটিও স্বভাবতঃ দয়াশীল হইয়াছিল। ছেলেরা পিতা মাতাকে যাহা করিতে দেখে তাহা চিরদিনের জন্য তাহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে তাহাই তাহাদের চরিত্রের প্রধান উপাদান হইয়া থাকে। বিনয় প্রতিদিন ছেলেটির জন্য দুধ লইয়া সনাতনের কুটীরে যাইত ও আপনার জল খাবারের পয়সা হইতে একটী পয়সা বাঁচাইয়া ছেলেটিকে দিয়া আসিত। ছোট ভাইদের পুরাতন জামা কাপড়ও আনিয়া দিত। বিধবা প্রতিদিন যথাসময়ে বিনয়ের প্রতীক্ষা করিত, এবং সে গৃহে প্রবেশ করিলেই কোলে বসাইয়া মুখে চুম খাইয়া বলিত, "বাবা, এই দুঃখিনীর সন্তানের প্রতি তোমার এত দয়া কেন? তুমি আমাকে যে সব জিনিষ পত্র দাও, তোমার মা তাহা জানেন ত?" বিনয় বলিত, "হাঁ, তিনি জানেন বই কি, আমি তাঁহাকে বলিয়া আনি।" নীরদা ইহা শুনিয়া মনে মনে বিনয়ের মাকে কতই কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিত! সে অনেক সময়ে ভাবিত, "আহা! বিনয়ের মা কি পুণ্যবতী! এমন ছেলে যাঁহার তাঁহার মত পুণ্যবতী আর কে আছে? ক্রমে নীরদা বিনয়কে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিল। সে এক দিন না আসিলে তাহার মন অস্থির হইয়া পড়িত, সে ছুটিয়া তাহাদের বাড়ী যাইত, এবং বিনয়কে কোলে লইয়া বলিত, "আজ তুমি তোমার কাঙ্গালিনীর বাড়ীতে যাও নাই কেন, বাবা? তোমাকে এক-

দিন না দেখিলে সমস্ত পৃথিবী যে আমার কাছে অন্ধকার বোধ হয়।" এই প্রকারে বিবিধ স্নেহবাক্যে তাহাকে আদর করিয়া, অবশেষে তাহার মাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিত।

চৈত্রমাস। মধ্যাহ্নকাল। প্রখর সৌরকরে মেদিনীর বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। বৃক্ষ পত্র সকল নিস্তেজ হইয়া নত হইয়া পড়িয়াছে। আতপ ক্লিষ্ট পক্ষিগণ স্পন্দহীন হইয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে। গোমেষাদি পশুগণ আহার ছাড়িয়া বটবৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে। রুক্ষ উষ্ণবায়ুর সংস্পর্শে শরীর আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় ছাত্রগণ দেখিতে পাইল, সনাতনের গৃহ হইতে বেগে ধূম ও অগ্নি-শিখা নির্গত হইতেছে। দেখিবামাত্র তাহারা ছুটিয়া গেল। সকলে অবিশ্রান্ত জল ঢালিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই আগুণ নিবাইতে পারিল না। হঠাৎ তাহারা গৃহমধ্যে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইল। সকলেই অত্যন্ত আশঙ্কিত হইল, এবং বুঝিল যে কাঙ্গালিনী শিশুটিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া কোন বিশেষ কার্য্যে বাহিরে গিয়াছে। বিনয় শিশুটিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। সে আর থাকিতে পারিল না, বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছেলেটিকে বাহির করিয়া আনিল। তাহার শরীরের অনেক স্থান পুড়িয়া গেল, কিন্তু সে যাতনা তাহার যেন অনুভবই হইল না। দুঃখিনীর অমূল্যনিধি শিশুটিকে যে বাঁচাইতে পারিয়াছে, সেই আনন্দেই সে বিহ্বল। অভাগিনী জননী তখনই ফিরিয়া আসিয়া সন্তানটিকে কোলে লইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিল, এবং বিনয় যে নিজের প্রাণ নাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবন সর্ব্বস্ব পুত্রটিকে বাঁচাইয়াছে—ইহা জানিতে পারিয়া, তাহার কাছে যাইয়া বলিল, "বাবা!" আর তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, সে দর দর ধারে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল!

মিলিলে অনেক কাজ হয়।

কোন গৃহস্থের বাড়ীতে একটা গাধা ছিল। যৌবন বয়সে সে প্রভুর অনেক কার্য্য করিত; তাঁহার জিনিষ পিঠে করিয়া প্রতিদিন বাজারে লইয়া যাইত, তাঁহার ছেলেকে বেড়াইতে হইয়া যাইত, আরও কত কি করিত। ক্রমে তাহার যৌবন চলিয়া গেল, বার্দ্ধক্যের সংস্পর্শে তাহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল, প্রভুর আর কোন কাজই করিতে পারে না। গৃহস্থ কিছুদিন তাহাকে খাওয়াইলেন; বেশী যে কিছু খাইতে দিতেন তা নয়, সন্ধ্যার সময় অল্প কিছু শুক্‌না ঘাস আর দুটি ছোলা দিতেন, আর সমস্ত দিন সে মাঠে মাঠে চরিয়া খাইত। কিছুদিন পরে নির্দ্দয় গৃহস্থ তাহার জন্য এই সামান্য ব্যয় করিতেও অনিচ্ছুক হইয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বেচারী অতি বিষণ্ণমনে মানবের অকৃতজ্ঞতাকে ধিক্কার দিতে দিতে রাজপথ দিয়া চলিল।

কেবল যে সুখের সময়েই বন্ধু পাওয়া যায় তাহা নহে, দুঃখের সময়েও কখনও কখনও বন্ধু মিলে। পথে গর্দ্দভের কয়েকটি বন্ধু জুটিল। প্রথম বন্ধু এক বৃদ্ধ কুকুর। তাহাকেও তাহার প্রভু বৃদ্ধ বয়সে কার্য্যে অক্ষম দেখিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বন্ধু এক বিড়াল। গৃহিণী তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় বন্ধু এক মোরগ। সে এক দিন গৃহস্থকে বলিতে শুনিয়াছিল যে তিনি তাহাকে কাটিয়া খাইবেন, তাই সে প্রাণ ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছিল।

ক্রমে দিবার অবসান হইল। চতুর্দ্দিক নীরব হইয়া আসিল, পক্ষিগণ

কোলাহল করিতে করিতে আপন আপন আবাসে ফিরিয়া চলিল। ইহারাই কেবল নিরাশ্রয় হইয়া বনভূমির নিবিড় অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শ্বাপদসঙ্কুল জনশূন্য অরণ্যে কি প্রকারে রাত্রি যাপন করিবে এই চিন্তায় তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িল। দৈবাৎ তাহারা দেখিতে পাইল, দূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। আশ্রয়ের আশায় তাহারা ধীরে ধীরে সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিল। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, এক খানি কুটীর, ভিতরে কতকগুলি লোক কোলাহল করিতেছে—কখনও নাচিতেছে, কখনও গাইতেছে, কখনও বা বিকট চীৎকার করিয়া বনভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। ইহারা দস্যু। কোন সাধু ব্যাক্তি তখন সেখানে থাকিলে কতই আনন্দ পাইতেন! সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ! মাঝে মাঝে কেবল ঝিল্লির ঝি ঝি রব কর্ণে প্রবেশ করিয়া সুধা ধারা বর্ষণ করিতেছে! বৃক্ষরাজি বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া স্নিগ্ধ হইয়াছে! সমস্ত বনভূমি যেন প্রফুল্ল হইয়া সহস্র বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত মহিমা ঘোষণা করিতেছে! দস্যুদের পক্ষে এ সকল নিরর্থক; যাহারা অসৎ কার্য্যে রত তাহারা সৃষ্টির মধুরতা কিরূপে আস্বাদন করিবে? সাধুচিত্তের জন্যই জগতে সৌন্দর্য্য আছে।

গর্দ্দভ তখন বলিল, এস ভাই ব্যাপারটা কি দেখি। আমি জানালার কাছে দাঁড়াই, কুকুর আমার পিঠে উঠুক, কুকুরের পিঠে বিড়াল উঠুক, আর বিড়ালের পিঠে মোরগ উঠিয়া দেখুক, ভিতরে কি হইতেছে। সকলে তাহাই করিল,। মোরগ উপরে উঠিয়াই ডাকিতে অরম্ভ করিল, তাহার স্বর শুনিয়া গাধা, কুকুর, বিড়াল সকলেই আপন আপন স্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। দস্যুরা তাহাদের এই ভীষণ সম্মিলিত রব শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এ কিরে ভাই? এমন চীৎকার ত কখনও শুনি নাই। নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভূতে ঘিরিয়াছে। চল,

পালাই।” এই বলিয়া দস্যুরা ভয়ে পলাইয়া গেল, আর বন্ধুরা ঘরে প্রবেশ করিয়া নির্ভয়ে সেখানে বাস করিতে লাগিল!

ধূলার কথা।

সুশীল। বাবা, কাল রাস্তায় বেড়াইতে গিয়া এমন ধূলা লাগিয়াছিল যে কাপড় চোপড় সব ময়লা হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটা এখনও কড়্ কড়্ করিতেছে। ধূলা সব রকমেই আমাদের অনিষ্টকর। নয় কি, বাবা?

বাবা। অনিষ্ট কিছু করে বটে, কিন্তু অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্টই বেশী করে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগতে কোন জিনিষই বৃথা সৃষ্ট হয় নাই।

সুশীল। সে কি, বাবা, ধূলা দ্বারা আবার কি উপকার্ হয়?

বাবা। এই সকাল বেলা তুমি দেখিতেছ, চারি দিক আলো হইয়াছে! যে জিনিষটা না থাকিলে চারি দিক কেবলই অন্ধকারময় হইত, সে জিনিষটা আমাদের অত্যন্ত হিতকর কি না?

সুশীল। নিশ্চয়ই; কিন্তু ধূলার সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ কি? সূর্য্যই ত আমাদের আলো দেয়।

বাবা। সূর্য্য হইতে আলোক রশ্মি আইসে বটে, কিন্তু যে বায়ু মণ্ডলের ভিতর দিয়া আইসে তাহাতে যদি ধূলা না থাকিত তাহা হইলে কখনই আলো হইত না; কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ধূলিশূন্য বায়ুর ভিতর দিয়া আলোক রশ্মি প্রবেশ করাইলে আলো না হইয়া অন্ধকার হয়।

সুশীল। ধূলা দ্বারা কি প্রকারে আলোর সাহায্য হয়?

বাবা। সূর্য্যের রশ্মি বায়ুমণ্ডলস্থিত ধূলিকণায় প্রতিভাত হয় বলিয়াই আলো হয়, নতুবা দুপুর বেলাও অন্ধকার থাকিত!

সুশীল। ধূলা দ্বারা আর কি কাজ হয়, বাবা?

বাবা। তোমরা আকাশে কেমন সুন্দর সুন্দর রঙ্‌ দেখিতে পাও—কোন স্থানে লাল, কোন স্থানে শাদা, কোন স্থানে নীল ইত্যাদি। এ সকলই সামান্য ধূলার কার্য্য। সূক্ষ্ম ধূলার ভিতর দিয়া সূর্য্য রশ্মি আসিলেই নীল রঙ হয়। আকাশে খুব উপরে সূক্ষ্ম ধূলা আছে বলিয়াই উপরের আকাশ ঘন নীল বর্ণ। ক্রমে মোটা ধূলার ভিতর দিয়া সূর্য্য কিরণ আসিতে আসিতে উজ্জলতর হইয়া আকাশের গায়ে নানা বর্ণ উৎপন্ন করে। এই ধূলা হইতেই ঐ সকল বর্ণ উৎপন্ন হয়; সূর্য্য কিরণের সাত রঙ্গের মধ্যে কোন কোন রঙ্‌ উহারা ধরিয়া রাখে, আর কোন কোনা রঙ্‌ ছাড়িয়া দেয়; সুতরাং নানা স্থানে নানা রঙ্‌ প্রকাশ পায়।

সুশীল। সকালে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশ এত সুন্দর দেখায় কেন?

বাবা। সকালে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্য অনেক দূরে থাকে, তাই সূর্য্য কিরণকে মধ্যাহ্ন অপেক্ষা অধিক ধূলিরাশির মধ্য দিয়া আসিতে হয়। নানা প্রকারের ধূলি নানা প্রকারের রঙ কাড়িয়া লয় ও ছাড়িয়া দেয়; সুতরাং এ সময়ে আকাশ নানা বর্ণে সাজিয়া অতি সুন্দর দেখায়।

সুশীল। মধ্যাহ্নে হয় না কেন?

বাবা। মধ্যাহ্নে সূর্য্য ঠিক আমাদের মাথার উপরে থাকে, সুতরাং সূর্য্য রশ্মিকে অত ধূলার মধ্য দিয়া আসিতে হয় না।

সুশীল। আমরা সকালে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্যের দিকে চাহিতে পারি, মধ্যাহ্নে পারি না কেন?

বাবা। সকালে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্য কিরণ বিস্তর ধূলার মধ্য দিয়া আসে এবং ঐ সকল ধূলিরাশি উহার অনেক তেজ কাড়িয়া লয়, সেই জন্যই

তখন আমরা সূর্য্যের দিকে চাহিতে পারি। মধ্যাহ্নে তদপেক্ষা নিকটে থাকে বলিয়া সূর্য্য কিরণকে ততটা ধূলির মধ্য দিয়া আসিতে হয় না, সুতরাং উহার তেজও ততটা অপহৃত হয় না; সেই জন্য দুপুর বেলা সূর্য্যের দিকে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।

সুশীল। ধূলাতে আর কি কাজ হয়, বাবা?

বাবা। ধূলির সাহায্যে মেঘ হয়, মেঘ গলিয়া বৃষ্টি হয়, বৃষ্টিদ্বারা ভূমি সরস হইয়া শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত হয়। বৃষ্টি না হইলে কেবল যে শস্য উৎপন্ন হইত না তাহা নহে, নদী, খাল, বিল, পুকুর কিছুই সম্ভব হইত না। কেন হইত না, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহা হইলেই দেখ, ধূলা আমাদিগকে অন্ন, বস্ত্র, জল সবই দেয়। কি আশ্চর্য্য!

সুশীল। ধূলার সাহায্যে কেমন করিয়া মেঘ হয়, বাবা?

বাবা। জলীয় বাষ্প ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘন হয় ও মেঘের আকার ধারণ করে। নতুবা মেঘ হইতে পারিত না।



দয়াশীলা বালিকার প্রতি

পাখী।

(১)

খাঁচার দুয়ার খুলে আজি
বলছ কেন "যাও,
আমার কারাবাসে কেন
আজকে ব্যথা পাও?
যে দিন ধ'রে এনেছিলে
শিকল বেঁধে পায়,
কত কেঁদে এসেছিনু
কাঁদিয়েছিনু মা'য়।

আকাশ জোড়া ভালবাসা
কেঁদেছিল বুকে,
তখন ত' কই কারো আঁখি
ঝরেনি মোর দুঃখে।

(২)

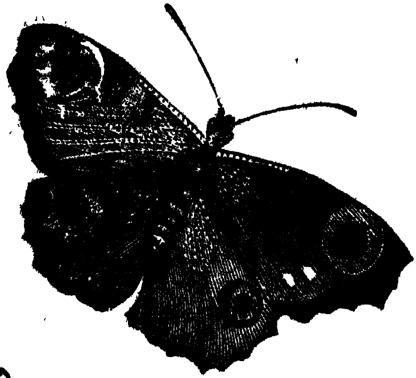
আমার ছিল তৃণকুটী
বর্ষা-বারিধারা,
সোণার ক্ষেতে হ'ত আমার
দিনের খেলা সারা
নিদয় হ'য়ে ছিনিয়ে নিলে
খাঁচা হ'ল ঘর,
তোমরা আমার আপন হ'লে
আপন হ'ল পর।
চক্ষু হ'তে জগৎ খানা
সেদিন স'রে গেল,
ব্যথা ভরা বুকের বাঁধন
ক্রমে স'য়ে এল !

(৩)

ভালবাসা ধীরে ধীরে
রুদ্ধ ঘরে আসে,
তার পেছনে তোমাদেরি
আঁখি গুলি ভাসে।
লোহার খাঁচা নয় ক' এটি
সব স্নেহের ফাঁসী,

পক্ষপুটে বক্ষে গলে
বাঁধে সোহাগ রাশি।
দুঃখ আমার স্নেহ হ'য়ে
ঘিরল চারি ধার,
কোন্ ভুলেতে ডুবে গেল
কথা আগেকার ?
নিদয় হ'য়ে শৈশবেতে
এনেছিলে ধ'রে,
সদয় হ'য়ে এখন ওগো
ছেড়ো নাক' মোরে।
ছোট ঘরে স্নেহ-ডোরে
র'ব আপান হারা,
বড় ঘরে অনাদরে
কেঁদে হব সারা!
এ ঘরেতে এত সোহাগ
কোথা ভেসে যাবে,
শূন্যমাঝে কে অচেনা
আমার পানে চা'বে ?"

৮




8

প্রজাপতি।

বাবা। সুশীল, ওটা কি জান?

সুশীল। না, বাবা।

বাবা। ওটা প্রজাপতি।

আহা! কি সুন্দর! কি উজ্জ্বল রঙ্! পাখার উপরে চারিটা চক্ষু দেখিতেছ ত? ওগুলি থাকাতে পাখা দুখানি আরও সুন্দর হইয়াছে! কিন্তু, সুশীল, এই পতঙ্গের পূর্ব্ব ইতিহাস শুনিলে তুমি একেবারে অবাক্ হইয়া যাইবে। বিধাতার কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি নিয়তই কদর্য্যতার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছেন!

সুশীল। সে কি রকম বাবা?

বাবা। ঐ গোলাপ ফুলটির দিকে একবার চাহিয়া দেখ। কেমন সুন্দর! কিন্তু মাটি হইতেই উঁহার উৎপত্তি! মাটি কি বিশ্রী! কিন্তু গোলাপের গাছটা কত সুন্দর! এবং ফুলটি আবার গাছের চেয়েও সুন্দর!

সুশীল। প্রজাপতিরও একটা কদর্য্য অবস্থা ছিল না কি?

বাবা। হাঁ, সুশীল; এমন কদর্য্য অবস্থা ছিল যে, সেই অবস্থা হইতে এই অতি সুন্দর অবস্থা যে কি প্রকারে হইল, তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না।

প্রথম ডিম্বাবস্থা অর্থাৎ কেবল একটা ছোট ডিম। তার পর ঐ দ্বিতীয় অবস্থা। কি বিশ্রী! এই দ্বিতীয় অবস্থাই কীটের অবস্থা। কীট ক্রমে বড় হইয়া তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় অবস্থায় এই কীট নির্জীব জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া থাকে এবং চারিদিকে একটী ডিম্বাকার আবরণ (গুটি) প্রস্তুত করে। কিছুকাল এই আবরণের ভিতরে থাকিয়া ঐ

চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তখন ঐ আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন !

গাছের আহার।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে হয়ত তোমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে রসই গাছের প্রধান খাদ্য। মাটি হইতে শিকড় যে রস টানিয়া লয়, তাহারই বলে গাছ বাড়ে। কিন্তু বস্তুত তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। গাছের প্রধান আহার সামগ্রী রস নহে; প্রধান আহার সমগ্রী বায়ু। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত কথা। বরং রস না হইলে গাছের চলিতে পারে, কিন্তু বায়ু না হইলে চলে না।

গাছের শরীরের নানা অংশ, কাঠ, লতা, ছাল ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যে কোন অংশ উত্তাপ দিয়া গরম কর, অথবা আধ পোড়া কর, দেখিতে পাইবে উহা ক্রমে কাল হইয়া আসিতেছে। গরম করিলে খানিকটা জল বাহির হইয়া যায়, খানিকটা ধোঁয়া হয়ত বাহির হইয়া যায়; যাহা পড়িয়া থাকে তাহা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ; উহাকে কয়লা বলে।

কাঠ, পাতা, ঘাস, খড়, যে কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থ হউক না কেন, এইরূপে গরম করিলে বা আধ পোড়া করিলে, খানিকটা জলীয় ও বায়বীয় ভাগ বাহির হইয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে তাহা ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। তাহার নাম কয়লা।

এই কৃষ্ণ বর্ণ কয়লাকে আবার পোড়াও। দেখিতে পাইবে, কয়লা প্রথমে গরম হইয়া রাঙা হইয়া উঠিবে ও ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকিবে। শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কয়লা পুড়িয়া যাইবে। কেবল একটু শাদা মত পদার্থ অবশিষ্ট থাকে; সে টুকু আর পুড়িতে চাহে না; তাহার নাম

ছাই বা ভস্ম। যত চেষ্টা কর এই ছাইটুকু কিছুতেই পুড়িবে না। একখানা প্রকাণ্ড কয়লার মধ্যে খানিকটা ছাই থাকে। সমস্ত কয়লাটা পুড়িয়া যায়, ছাইটুকু কিছুতেই পোড়ে না। কয়লা ও ছাই উভয়ের মধ্যে এই তফাৎ। কয়লা কৃষ্ণ বর্ণ, ছাই কতকটা শাদা।

কাঠ, পাতা, ঘাস, খড়, এই সকল পদার্থের মধ্যে কয়লাও আছে ছাইও আছে। কয়লার ভাগ অনেক বেশী, ছাই অনেক কম। এখন প্রশ্ন এই যে, এই এতটা কয়লা ও এইটুকু ছাই আসিল কোথা হইতে?

দুইটা জলের বাটী লও; একটাতে একখানা কয়লা ফেলিয়া দাও, আর একটাতে একটু ছাই ফেলিয়া দাও। দেখিবে কয়লা কোন মতেই জলের সহিত মিশবে না; যতই চেষ্টা কর, জল আর কয়লা পৃথক হইয়া থাকিবে। কয়লাকে চূর্ণ করিয়া জলে ফেল, তথাপি মিশিবে না। আবার ছাঁকিয়া ফেলিলে কয়লাকে বাহির করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ছাই তেমন নহে। অল্পক্ষণেই ছাই জলে দ্রবীভূত হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যাইবে। লবণ, চিনি প্রভৃতি যেমন জলে গলিয়া যায়, ছাইও সেইরূপ জলে গলে। ছাই জলে মিশে, কিন্তু কয়লা কোন মতে মিশে না।

ছাই জলে গলিয়া যায়, কয়লা গলে না। আবার কয়লা পুড়িয়া যায়; কিন্তু ছাই কোন ক্রমেই পোড়ে না। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

কয়লা পুড়িলে কি হয় কয়লা? পুড়িয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়। বায়ু নানাবিধ। সকল বায়ুর গুণ সমান নয়। কয়লা পুড়িয়া যে বায়ু হয়, সে এক রকম বায়ু। এ বায়ু আমরা চোখে দেখিতে পাই না; কিন্তু অন্য উপায়ে ইহাকে ধরিতে পারি।

এক রকম বায়ু আছে তাহা নহিলে আমরা বাঁচি না। বায়ুতে আমরা নিশ্বাস লই, নিশ্বাস গ্রহণের সময় সেই বায়ু আমাদের শরীরের মধ্যে যায়। সেই বায়ুতেই আবার প্রদীপ জ্বলে। সেই বায়ুর যাতায়াতের জন্য

লণ্ঠনের নীচে ও উপরে ছিদ্র বা যাতায়াতের পথ রাখিয়া দিতে হয়। সেই বায়ুর প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইলে প্রদীপ জ্বলে না, আগুনও জ্বলে না। আবার সেই বায়ু ব্যতীত আমরা নিশ্বাস লইতে পারি না। ইহাকে বলিব এক নম্বরের বায়ু। আর এক রকম বায়ু আছে, তাহার গুণ অনেকাংশে বিপরীত। এই বায়ুর মধ্যে মানুষকে রাখিয়া দিলে মানুষ তৎক্ষণাৎ শ্বাসরোধ হইয়া মরিয়া যায়। এই বায়ুর মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া দিলে তখনই নিবিয়া যায়। ইহাকে বলিব দুই নম্বরের বায়ু।

প্রদীপের তেলে ও বাতির চর্ব্বিতে যথেষ্ট কয়লা আছে; প্রদীপ ও বাতি যখন জ্বলে, তখন এই কয়লা পুড়িতে থাকে। কয়লা আছে তাহা সহজেই দেখান যাইতে পারে। দীপশিখার উপরে একখানি ঠাণ্ডা রেকাব ধর। দেখিবে রেকাবের গায়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কয়লা জমিবে। তেল ও বাতি জ্বলিবার সময় এই কয়লা পোড়ে। কয়লার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুঁড়াগুলি উত্তাপে রাঙা হয়, তাহাতেই আমরা আলো পাই। কয়লা পুড়িয়া এই দুই নম্বরের বায়ুতে পরিণত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি এক নম্বরের বায়ু ব্যতীত প্রদীপ জ্বলে না, বাতি জ্বলে না, কয়লা পোড়ে না।" জ্বলিবার সময় ও পুড়িবার সময় কয়লার সহিত এই এক নম্বরের বায়ুর সংযোগ ঘটে, কয়লা বায়ুর সহিত মিলিয়া যায়; উভয়ে মিলিয়া দুই নম্বরের বায়ু তৈয়ার হয়।

এখন বাতি জ্বলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে। বাতিতে কয়লা আছে। সেই কয়লা এক নম্বরের বায়ুর সহিত মিশে; ফলে দুই নম্বরের বায়ু তৈয়ার হয়। কয়লা ও এক নম্বরের বায়ুর একত্র যোগে দুই নম্বরের বায়ু প্রস্তুত হয়। দুই নম্বরের বায়ুর মধ্যে কয়লা ও এক নম্বরের বায়ু উভয়েই বর্ত্তমান থাকে।

এক নম্বর ও দুই নম্বর উভয় বায়ুই আমাদের চোখের অদৃশ্য। এক

নম্বরের বায়ুতে কয়লা মিশিয়া সেই কয়লা পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন আর সে কয়লা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু সেই কয়লা দুই নম্বরের বায়ুর মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। দুই নম্বরের বায়ুর মধ্যে এই কয়লা বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু আমরা সহজে এই কয়লা আবার বাহির করিয়া লইতে পারি না। এক নম্বরের বায়ুর সহিত কয়লাকে মিশাইয়া দুই নম্বরের বায় তৈয়ার করা সহজ; কিন্তু দুই নম্বরের বায়ুকে ভাঙ্গিয়া সেই কয়লা পুনবায় বাহির করিয়া ফেলা আমাদের অসাধ্য। আমরা পারি না কিন্তু সূর্য্যদেব পাবেন। সূর্য্যের কিরণ দুই নম্বরের বায়ুর ছোট ছোট কণাতে প্রচণ্ড ঘা দেয়; আর কণা গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া কয়লা বাহির হইয়া পড়ে।

আমরা যে বায়ু রাশির মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া যে বায়ুরাশি আছে, যে বায়ুরাশি একটু নড়িলেই ঝড় হয়, সেই বায়ুরাশির মধ্যে উভয় বায়ুই বর্ত্তমান আছে। এক নম্বরের বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে আছে; দুই নম্বরের বায়ুও কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে। এই দুই নম্বরের বায়ু যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে, তাহাতেই গাছ পালার জীবন রক্ষা হয়।

অধিকাংশ গাছ শত সহস্র সবুজ রঙ্গের পাতা বিছাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মনুষ্য, পশু ও পক্ষী খাদ্য সামগ্রী উদরস্থ করে; এই সকল পাতাই যেন গাছের উদর। সূর্য্যের কিরণে দুই নম্বরের বায়ু হইতে যে কয়লা বাহির হয়, এই সকল পাতা সেই কয়লাকে গ্রাস করে ও আত্মসাৎ করে। কয়লা পাতার মধ্যে মিশিয়া যায়।

এইরূপে গাছের শরীরে পাতার সাহায্যে ও রৌদ্রের সাহায্যে কয়লা সঞ্চিত হইতে থাকে। গাছের প্রধান খাদ্যই কয়লা; গাছ এইরূপে আপনার খাদ্য সংগ্রহ করে।

সূর্য্যকিরণের সাহায্য না পাইলে, পাতা আপনা হইতে কয়লা সংগ্রহ

করিতে পারে না ; এই জন্য অন্ধকারে, সূর্য্য কিরণের অভাবে গাছ বাড়ে না। গাছের বৃদ্ধির জন্য সূর্য্য আবশ্যক।

এখন বুঝিতে পারিলে, গাছের প্রধান আহার কি ? উপরে বলিয়াছি গাছের শরীরে যেমন কয়লা আছে, তেমনই একটু ছাইও আছে। ছাই জলে গলে। মাটীর মধ্য হইতে যে রস মূলদ্বারা আকৃষ্ট হয়, সেই রসে এই ছাই আছে। লোণা জলে যেমন লবণ থাকে, সরবতে যেমন চিনি থাকে, মৃত্তিকাস্থিত রসে সেইরূপ এই ভস্ম দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। গাছের শিকড় সেই রস টানিবার সময় ছাই সমেত গ্রহণ করে।

কিন্তু একথা মনে রাখিও, গাছের প্রধান আহার বায়ু।

বলিতেছি, বাবা বলিতেছি।

বাবা। সুশীল, তোমাকে একটা প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দিতে পারিবে কি ?

সুশীল। কি প্রশ্ন, বাবা ? আমাকে বলুন, আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

বাবা। তবে শুন, সুশীল !

পুরাকালে ভারতবর্ষে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতি ন্যায়বান্ রাজা, তাঁহার রাজ্যে কেহ কোনও অন্যায় করিয়া নিষ্কৃতি পাইত না, এবং তিনি নিজেও অতি সাবধানে অন্যায় অধর্ম্মকে পরিহার করিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে, প্রজাগণের মঙ্গলার্থেই তাঁহার জীবন, সুতরাং তিনি প্রাণপণে তাহাদিগের হিতসাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রজাগণও তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত

ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যশোগান করিত! রাজার অন্তরে আনন্দ আর ধরিত না; শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে যথাশক্তি রাজ-কর্ত্তব্য পালন করিতেন বলিয়া আত্মপ্রসাদে সদাই তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল থাকিত! কিন্তু এ জগতে অমিশ্র সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না; সুন্দর মনোহর গোলাপের সঙ্গে যেমন কণ্টক থাকে, আমাদের সুখের সঙ্গেও সেইরূপ কিঞ্চিৎ দুঃখ মিশ্রিত থাকে। রাজা অপুত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার সাধু হৃদয়েরও একদেশে একটা গভীর দুঃখের কারণ লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার আকার দেখিয়া তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না সত্য, কিন্তু রাজা অন্তরে অন্তরে এই কারণে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেন।

এইরূপে সুখেদুঃখে দিন যাইতে লাগিল। রাজা ও রাণী পুত্রলাভে একরূপ নিরাশ হইয়া বিশেষরূপে ইষ্টদেবতার সেবায় দেহ মন সমর্পণ করিলেন। দৈবাৎ রাণী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন, রাজার তিমিরাচ্ছন্ন মুখে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। যথা সময়ে রাজ্ঞী একটি সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। পুরী ও নগরী গীত বাদ্যে নিনাদিত হইল! এই আনন্দের দিনে রাজা পুত্রের মঙ্গল কামনায় দুঃখী দরিদ্রদিগকে রাজহস্তীর পরিমাণে স্বর্ণ দান কবিলেন। সুশীল, বলত, কিরূপে হস্তীর সঙ্গে স্বর্ণের ওজন হইল?

সুশীল। বলিতেছি, বাবা, বলিতেছি, একটু দেরি করুন। বালক অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, —

"কোন নদীতে এত বড় একখানা নৌকা আনিয়া বাঁধুন, যাহা হাতীর ভারে ডুবিয়া যাইবে না। তার পর মোটা মোটা তক্তা পাতিয়া তীর ও নৌকা সংযুক্ত করুন্। তারপর আস্তে আস্তে হাতীটাকে নৌকার উপর লইয়া গিয়া, নৌকা যে পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইল সেই পর্য্যন্ত চিহ্নিত করিয়া হাতীটাকে নামাইয়া লউন। তারপর নৌকার ভিতরে সোণা

ফেলিতে আরম্ভ করুন, এবং যতক্ষণ নৌকা উক্ত চিহ্ন পর্য্যন্ত পুনরায় মগ্ন না হয়, ততক্ষণ ফেলিতে থাকুন, নৌকা চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবিলে আর ফেলি-বেন না। নৌকায় যে সোণা ফেলা হইল তাহার ভার হাতীর ভারের সমান!"

বাবা। সুশীল, তুমি ঠিক বলিয়াছ। এইরূপেই স্বর্ণ ওজন করা হইয়াছিল।

একটি প্রদীপ।

স্কটলণ্ডের উত্তরে অর্কনি দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া কতকগুলি দ্বীপ আছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উহার একটি দ্বীপে একজন জেলে এক মাত্র অল্পবয়স্কা কন্যা লইয়া বাস করিত।

দ্বীপের চারিদিকে সমুদ্র, তাহাতে অনেক জলমগ্ন পাহাড়। ঝড় ও অন্ধকার রাত্রিতে অনেক নৌকা ঐ সকল পাহাড়ে লাগিয়া মারা যায়।

একদিন জেলে নৌকা লইয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তাহার আর দেখা নাই। চারিদিকে অন্ধকার করিয়া আকাশে কাল কাল মেঘ উঠিল, প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। নির্জ্জন কুটীরে প্রদীপ জ্বালিয়া বালিকা পিতার প্রতীক্ষায় সারা রাত্রি জাগিয়া রহিল; কিন্তু তাহার পিতা আর ফিরিলেন না।

পরদিন প্রভাতে বালিকা পিতাকে খুঁজিতে বাহির হইল। ঝড় তখন থামিয়া গিয়াছে, সমুদ্র অনেকটা স্থির। কিছু দূরে গিয়াই দেখিল, বালুকাময় সমুদ্রতীরে পিতার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সে বুঝিল, অন্ধকারে

পাহাড়ে নৌকা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই তাহার এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

সেই দিন পিতার মৃতদেহের পাশে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, দেহে জীবন থাকিতে সে আর কোনও নৌকা সেই পাহাড়ে লাগিয়া জলমগ্ন হইতে দিবে না। এই সংকল্প করিয়া সে প্রতি-দিন সন্ধ্যাকালে জানালায় একটি পদীপ জ্বালিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিত, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে শয়ন করিতে যাইত। সংসারে পিতা ভিন্ন তাহার আপনার লোক আর কেহই ছিল না; সুতরাং জীবিকা উপার্জ্জন ও রাত্রিতে আলো জ্বালাইবার তৈল কিনিবার জন্য সে সারা রাত্রি বসিয়া বসিয়া চরকায় সুতা কাটিত। এইরূপে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সেই বালিকা তাহার বাল্যের প্রতিজ্ঞা প্রতিদিন সমান ভাবে পালন করিয়া আসিতেছে। সে আর এখন বালিকা নয়। বাল্য ও যৌবন এই একই ব্রতে সমর্পণ করিয়া সে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে। ক্ষুদ্র দ্বীপে নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া এই নারী যে কত লোকের প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পিতার মৃত্যুর রাত্রি হইতে এই পঞ্চাশ বৎসর সে এক রাত্রিও ঘুমায় নাই; শীতে ও গ্রীষ্মে, দুর্য্যোগে ও পরিষ্কৃত রজনীতে চিরদিন সমান ভাবে জানালায় প্রদীপ জ্বালিয়া, রাত্রি জাগরণ করিয়াছে। ধ্রুব তারার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাবিক যেমন নির্ভয়ে অকূল সাগর পার হইয়া যায়, এই দুঃখিনীর কুটীরের উজ্জ্বল আলোকের প্রতি নির্ভর করিয়া কত জেলে নির্ভয়ে সমুদ্রে গিয়াছে এবং ঐ আলোক দেখিয়া ঝড় বৃষ্টিতে নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে!

আজ বাবরের মৃত্যু নিশ্চিত!

তোমরা ইতিহাসে সুলতান বাবরের বৃত্তান্ত পড়িয়াছ। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ পানিপথের যুদ্ধে পাঠান সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাবর তাঁহার হিন্দু প্রজাদিগকে অতি কঠোর নিয়মে শাসন করিতেন, সুতরাং তিনি মহামতি রাজকুলভূষণ আকবরের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। স্থূলদর্শী রাজগণ চিরদিনই মনে করিয়াছেন যে, বলপ্রয়োগই রাজ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; ইতিহাস চিরদিনই অতি বিশদরূপে এই মতের অসারতা প্রমাণ করিয়া আসিতেছে। এ জগতে কত প্রবল সাম্রাজ্য উঠিল ও পড়িল, কে তাহার গণনা করিবে? এক্ষণে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে তাহাদের নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে!

গোহর নামে এক জনহিন্দু সৈনিক পুরুষ স্বজাতীয়দিগের দুঃখে অতীব দুঃখিত হইয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, তিনি বাবরকে হত্যা করিয়া প্রপীড়িত হিন্দুজাতির দুঃখ দূর করিবেন। তিনি জানিতেন, বাবর স্বীয় প্রাসাদে আবদ্ধ থাকেন না, অনেক সময়ে ছদ্মবেশে নগরে বাহির হইয়া প্রজাগণের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দর্শন করেন। গোহর একদিন একখানি শাণিত ছুরিকা পরিচ্ছদের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া সম্রাটের অন্বেষণে নগরাভিমুখে চলিলেন এবং পথে যাইতে যাইতে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, আজ "বাবরের মৃত্যু নিশ্চিত! আজ বাবরের মৃত্যু নিশ্চিত!"

শীঘ্রই তিনি নগরের জনাকীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহারই মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ নগরে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল, সকলেই ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত। দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড হস্তী ছুটিয়া আসিতেছে, সম্মুখে যাহা পাইতেছে

তাহাই পায়ের নীচে ফেলিয়া দলন করিতেছে, আর শত শত লোক প্রাণ-ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে! এমন সময় কোন স্ত্রীলোকের কোল হইতে একটি শিশু রাস্তায় পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই হস্তী আসিয়া, হয় তাহাকে পায়ের তলায় পিশিয়া ফেলিবে, না হয় শুঁড়ে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার অস্থি চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। হায়! হায়! দুঃখিনীর সন্তানকে রক্ষা করিবার কি কেহই নাই?

হঠাৎ একজন লোক জনতার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং অতি দ্রুতপদে রাস্তার উপর যাইয়া শিশুটিকে তুলিয়া আনিল। আর এক মুহূর্ত্ত দেরি হইলে দুইজনেই হস্তীর পদতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইত!

এক দীর্ঘকায় সুন্দর পুরুষ, পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু তাঁহার সেই মলিন বেশের মধ্য হইতে বীরত্বের তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে! সকলেই বলিতে লাগিল, "লোকটি কে?„

তিনি আসিয়া যেমন শিশুটিকে গোহরের নিকট রাখিলেন, অমনি তাঁহার পাগড়ী খুলিয়া গেল এবং গোহর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ছুরিকা খানি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া, বলিলেন, "মহারাজ! এই ছুরিকা হস্তে গ্রহণ করুন্ এবং যে আপনার প্রাণনাশ করিতে আসিয়াছিল, স্বহস্তে তাহাকে বধ করুন্। আমি আজ আপনার প্রাণনাশ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রাণ নাশ করা অপেক্ষা 'প্রাণরক্ষা করাই মহত্ত্বের কার্য্য!" সম্রাট্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি ঠিক বলিয়াছ, প্রাণ নাশ করা অপেক্ষা রক্ষা করাই মহত্ত্বের কার্য্য; অতএব আমি তোমার প্রাণ নাশ করিব না, কিন্তু আজ হইতে তোমাকে আমার কার্য্যে জীবন যাপন করিতে হইবে। আমি তোমাকে আমার শরীর রক্ষক নিযুক্ত করিলাম।"



নিবেদন।

কর্ত্তব্য সাধনে মোরে
পর্ব্বতের মত কর
অচল, অটল ;
হৃদয়ে উৎসের মত
সদা উথলিত হোক্
করুণার জল।
আকাশের মত কর
বিশাল, উদার, প্রভু,
হৃদয় আমার ;

সাঁজের তারার মত
উঠুক্ ফুটিয়া তায়
মহিমা তোমার।
চিন্তাগুলি কর মোর
বাসন্তী চাঁদিমা মত
শুভ্র সুবিমল;
কথাগুলি হয় যেন
বিনীত মধুর আর
সত্য, সুশীতল।
হাত দুটি সদা যেন
ভালবেসে দিতে পারি
পরের মঙ্গলে,
তাহ'তে বিমুখ হ'য়ে
আপনার স্বার্থ ল'য়ে
নাহি থাকি ভুলে।

সমাপ্ত।